প্রথম বর্ষ ॥ চতুর্থ সংখ্যা ॥ শ্রাবণ ॥ ১৩৮২

আনন্দমেলা

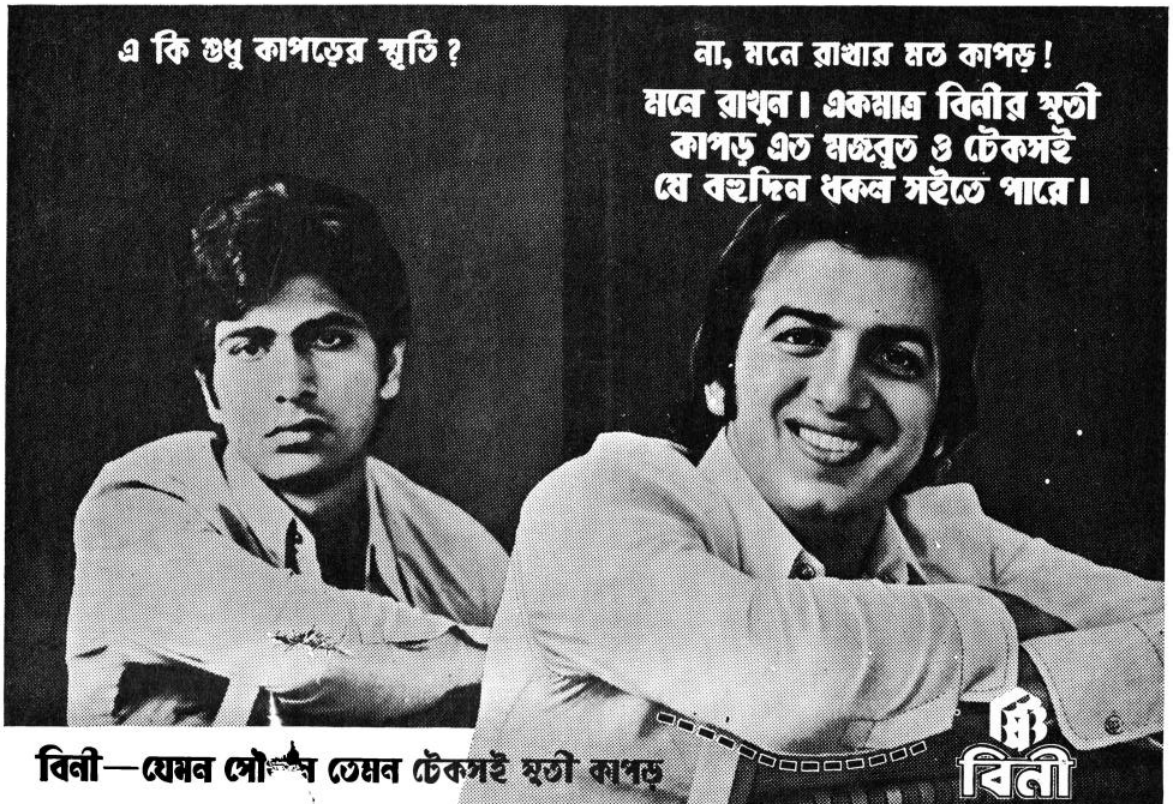

BCCM-31 75 BEN

আনন্দমেলা

প্রথম বর্ষ ॥ চতুর্থ সংখ্যা
শ্রাবণ ॥ ১৩৮২
দেড় টাকা

ছড়া	অমিতাভ চক্রবর্তী ৪
উপন্যাস	কাপালিকরা এখনও আছে। বিমল কর ১৭
	রাজা হওয়ার ঝকমারি। বিমল মিত্র ৩৬
উপকথা ও গল্প	হপা। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১২
	কৈলাসে চা পান। আশাপূর্ণা দেবী
	পিসীমার পোষা বাঘ। শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় ২৮
	গ্রহ থেকে। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ৩১
	কুঠির মাঠে। মহাশ্বেতা দেবী ৪২
	নানান দেশের গল্পসল্প। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৮
কমিক্‌স্‌	টিনটিন। কাঁকড়া-রহস্য ৬, ৭, ১০, ১১
	টারজান ৪৬ ৪৭ ৫০ ৫১
বিজ্ঞান জীবনী ও প্রবন্ধ	শূন্য কবে এলো। কল্লোল মজুমদার ৫৪
	ফুটবলের যাদুকর পেলে। বীরু চট্টোপাধ্যায় ৪৮
নিয়মিত বিভাগ	ধাঁধা ৫ আচ্ছা বলোতো ৫
	ম্যাজিক। পি সি সরকার জুনিয়ার ১৬
	মজার অঙ্ক, অঙ্কের মজা ১৭
	ম্যাজিকের মত ১৭
	রাজায় রাজায় ৩৫
	জানা না-জানা ৪০
	যাদুঘর শ্রীপান্থ ৪১
	আজব চিড়িয়াখানা। বহুরূপী ৫২
	জানা না-জানা ২৬, ৩৫, ৪০, ৪৫
তোমাদের পাতা	দেখে চলো রাস্তা। শর্মিলা ঘোষাল
	পালোয়ান বক্‌শী। সুমিতা দাস
প্রচ্ছদ	শৈবাল ঘোষ

সম্পাদক ॥ অশোককুমার সরকার
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮ সি. আই. টি রোড, কলিকাতা-৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

পূর্বাঞ্চলে বিমানের জন্য অতিরিক্ত মাশুল ১৫ পয়সা

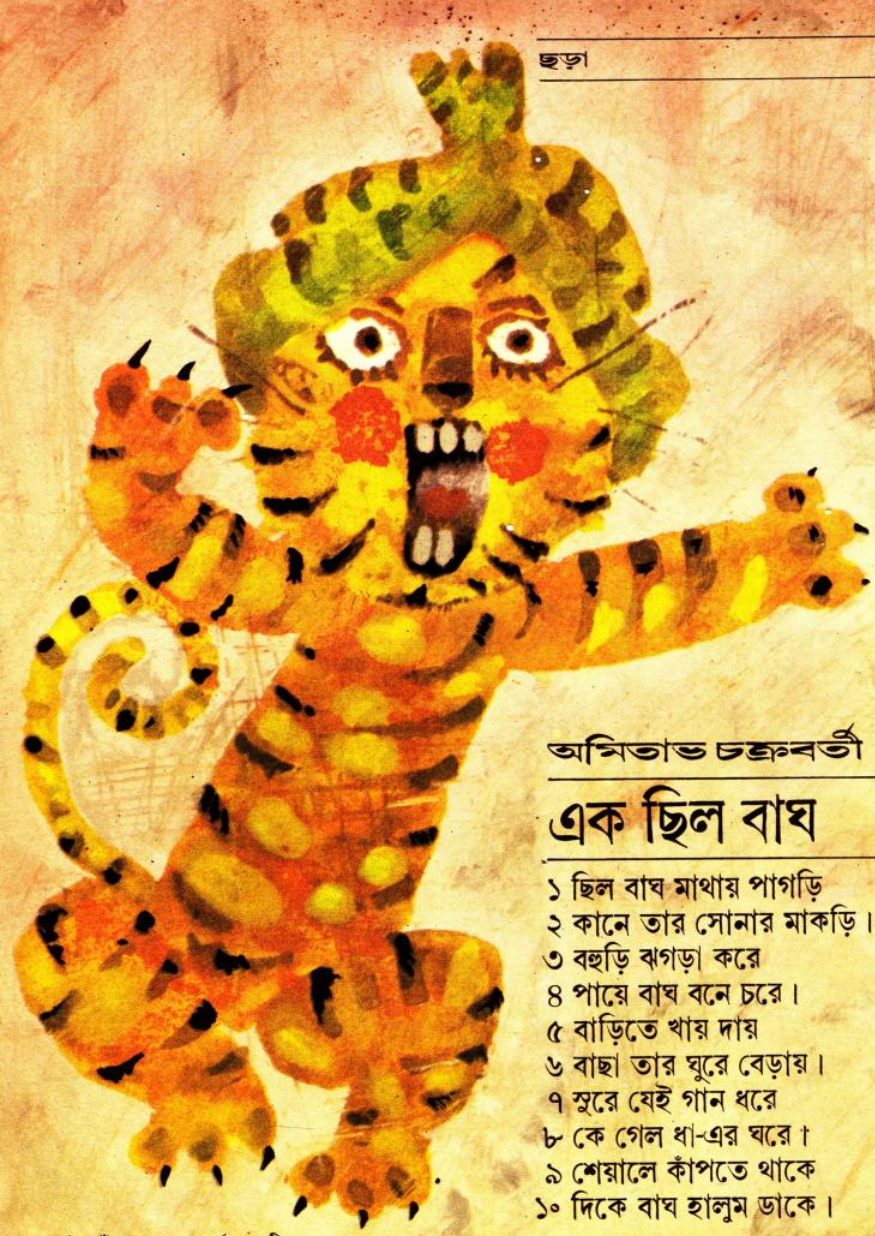

অমিতাভ চক্রবর্তী

এক ছিল বাঘ

১ ছিল বাঘ মাথায় পাগড়ি
২ কানে তার সোনার মাকড়ি।
৩ বহুড়ি ঝগড়া করে
৪ পায়ে বাঘ বনে চরে।
৫ বাড়িতে খায় দায়
৬ বাছা তার ঘুরে বেড়ায়।
৭ সুরে যেই গান ধরে
৮ কে গেল ধা-এর ঘরে।
৯ শেয়ালে কাঁপতে থাকে
১০ দিকে বাঘ হালুম ডাকে।

ছবি এঁকেছেন ॥ পূর্ণেন্দু পত্রী

ধাঁধার পাতা

কী কুক্ষণেই না ছোট্‌কার কাছে ইতিহাস পড়তে গিয়েছিলাম।

প্রথমেই তো চেপে ধরলো, "ইতিহাস মানে কী? কথাটা এলো কোথা থেকে?"

"মানে আবার কী? ইতিহাস হলো ইতিহাস।" কিছু না ভেবেই আমি চটপট উত্তর দিয়ে ফেলি, "যা অঙ্ক নয়, ভূগোল নয়, ইংরেজী নয়, বাংলা নয়—তা-ই ইতিহাস।"

"এ তো দেখছি ঐতিহাসিক উত্তর! ছোট্‌কার হাত ততক্ষণে আমার চুল ছুঁয়েছে। ভেংচি-কাটা গলায় ছোট্‌কা বললো, "তার চেয়ে বললি না কেন, যা রাজহাঁস নয়, পাতি-হাঁসও নয়, তা-ই ইতিহাস!"

ইস্! এই স্মার্ট উত্তরটা যে কেন মনে এলো না আমার! অগত্যা চুপ করে থাকি। কেননা, শেষ পর্যন্ত পড়াটা তো বুঝতে হবে। আর নতুন ধাঁধাও চাই।

ইতিহাস পড়া শেষ করে ছোট্‌কার কাছে ধাঁধা চাইলাম। ছোট্‌কা বললো, 'এবারের প্রথম দুটো ধাঁধা ঐতিহাসিক। তার মানে, উত্তর খুঁজতে হবে ইতিহাসের বইতে।"

ছোট্‌কা বলে গেল। আমি টপাটপ লিখে নিলাম।

প্রথম ধাঁধা॥

নামের শেষে যোগ করি যদি হ্রস্ব ই,
কোঁকড়ানো চুল ঝুলবে অতি অবশ্যই।
নিজের আয়ু ছেলের হাতে দিলেন, আর
তুলে নিলেন ছেলের কঠিন রোগের ভার।

দ্বিতীয় ধাঁধা॥

বিখ্যাত বীর ইতিহাসে দুর্ধর্ষ,
অথচ মৌলিক সেই! নাম বলো কস্য?
মাথাটুকু কেটে নিলে পড়ে থাকে অশ্ব,
আদি দুই অক্ষরে বাঙালী অবশ্য।

তৃতীয় ধাঁধা॥ (ক) ১ থেকে ৯ পর্যন্ত রাশিগুলিকে এমনভাবে সাজাও যাতে উত্তর হয় ১০০। (ভগ্নাংশ কিংবা দশমিক চলবে না)

(খ) ভগ্নাংশের সাহায্যে ওই উত্তর করো।

(গ) এবার একইভাবে সাজাও, দশমিক ব্যবহার করে।

চতুর্থ ধাঁধা॥ দারুণ-দারুণ সব স্ট্যাম্প বেরিয়েছে। পাঁচরকম স্ট্যাম্প। দামও প্রতিটি পাঁচ পয়সা। ধরো, তুমি বন্ধুদের পোস্টকার্ড পাঠাতে চাও রকমারী নতুন স্ট্যাম্প লাগিয়ে। বিভিন্ন রকম নতুন স্ট্যাম্প লাগিয়ে কমপক্ষে কটা পোস্টকার্ড তুমি পাঠাতে পারো? মনে রেখো, কোনো বন্ধু অন্য বন্ধুর মতো স্ট্যাম্প পাবে না। প্রত্যেকের আলাদা-আলাদা সেট হবে।

এবারে, গতবারের ধাঁধার উত্তর।

প্রথম ধাঁধা॥ গল্পটি রবীন্দ্রনাথের লেখা। 'গল্পসল্প' বইতে আছে। গল্পের নাম 'বাচস্পতি'। যে-চরিত্র ওই বিচিত্র ভাষায় কথা বলতো তার নামও বাচস্পতি। বুগবুলবুলি ভাষার একটা ইংরেজী তর্জমা শুনবে? যা শুনে ছোটলাট একেবারে টরেটম বনে গিয়েছিল?—"দি হাম্বারস্কুয়াস ইন-ফ্যাচুফুয়েশন অব আকবর ডর্বোন্ডি-ক্যালিল্যাসেরট ইজট্ দি গর্ব্যান্ডিজস্ অফ হুমায়ুন।"

গল্পটা না পড়ে থাকলে, আজই পড়ে নাও।

দ্বিতীয় ধাঁধা॥ (ক) জাম (খ) তাল

তৃতীয় ধাঁধা॥ $\frac{১৪৮}{২৯৬} + \frac{৩৫}{৭০} = ১$

চতুর্থ ধাঁধা॥ প্রথমে থলিগুলোতে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত চিহ্ন দিয়ে নিতে হবে। এবারে ১ নম্বর থলে থেকে ১টি বাটখারা, ২ নম্বর থলে থেকে ২টি এইভাবে ১০ নম্বর থলে থেকে ১০টি পর্যন্ত বাটখারা বার করে নিতে হবে।

প্রত্যেকটি বাটখারার ওজন যদি ১ কে জি হতো তাহলে মোট ওজন হয় ১ + ২ + ৩ + ৪ + ৫ + ৬ + ৭ + ৮ + ৯ + ১০ = ৫৫ কে জি। কিন্তু একটিতে ১১০০ গ্রামের বাটখারা রয়েছে। তাই ওজন হবে ৫৫ কে জির বেশী। ক'শ গ্রাম ওজন বেশী হয়েছে একবার ওজন করেই জানা যাবে। সেই নম্বরের থলেতেই রয়েছে বেশী-ওজনের বাটখারা।

সত্যসন্ধ

আচ্ছা বল তো

প্রঃ ফুল কখন গরম হয়?
উঃ যখন ফোটে।

প্রঃ অঙ্ক কষতে গিয়ে খোকন পেন্সিল গিলে ফেলেছে—এখন কি হবে?
উঃ অঙ্কটা শেষ হবে না।

প্রঃ নশো নিরানব্বই গ্রামের পরে মারপিটের ভয় কেন?
উঃ কারণ তার পরেই কিলো।

প্রঃ কোন বাগানে গাছপালা নেই?
উঃ মোহনবাগান।

প্রঃ পাতা কখন লেখাপড়া শেখে?
উঃ যখন পড়ে।

প্রঃ দু পাটি চটির মধ্যে কিসের সম্পর্ক?
উঃ চটাচটির।

প্রঃ শহরে ওজন নেওয়া যায় না কেন?
উঃ আজকাল সব ওজনই গ্রামে।

প্রঃ কোন স্টেশনে ট্রেন আসে না?
উঃ রেডিও স্টেশনে।

প্রঃ সেকালে কি ছিল যা একালে নেই?
উঃ 'স'

প্রঃ তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধ কোথায় হয়েছিল?
উঃ পাণিপথে।

প্রঃ একটা খালি খাঁচার মধ্যে কত-গুলো সিংহ পোরা যায়?
উঃ একটাই। কারণ তার পরে আর খাঁচাটা খালি থাকে না।

গাধা কোথাকার! এখন আবার তাকে খুঁজে মরতে হবে! তার উপরে আবার.....
...এখন তার কাছে রয়েছে রিভলবার!
এগুলির মধ্যে যদি খাবার-টাবার থাকে, তাহলে চিন্তা নেই, অনেকক্ষণ ধরে যুঝে যেতে পারব!.....
TOP
FRAGILE
BOTTOM
TOP
FRAGILE
BOTTOM
দেখা যাক.....
ওরেব্বাস, রাশি-রাশি কাঁকড়ার টিন!
যা ভেবেছি, সেই টিন আর এই টিন হুবহু এক!
পরে এ নিয়ে ভাবা যাবে, এখন অন্য বাক্সগুলো দেখা যাক!
এ যে শ্যামপেন! ওরে কুটুস, আমাদের খাদ্য আর পানীয়, দুয়েরই ব্যবস্থা হয়ে গেল!
আরে একি!
এই নে, একটু খেয়ে দ্যাখ্ কুটুস!
শ্-শ্-শ্.....
ওরা আমাদের খুঁজতে এসেছে! হুঁশিয়ার!
দম্... দমাদম্...
দরজার পিছনে বাক্স-টাক্স ঠেকো দিয়ে রেখেছে! যাক্ গে, ব্যাটাকে না-খাইয়ে শুকিয়ে মারব!
আরে, স্রেফ কাঁকড়া খেয়ে কাটিয়ে দেব!
!?

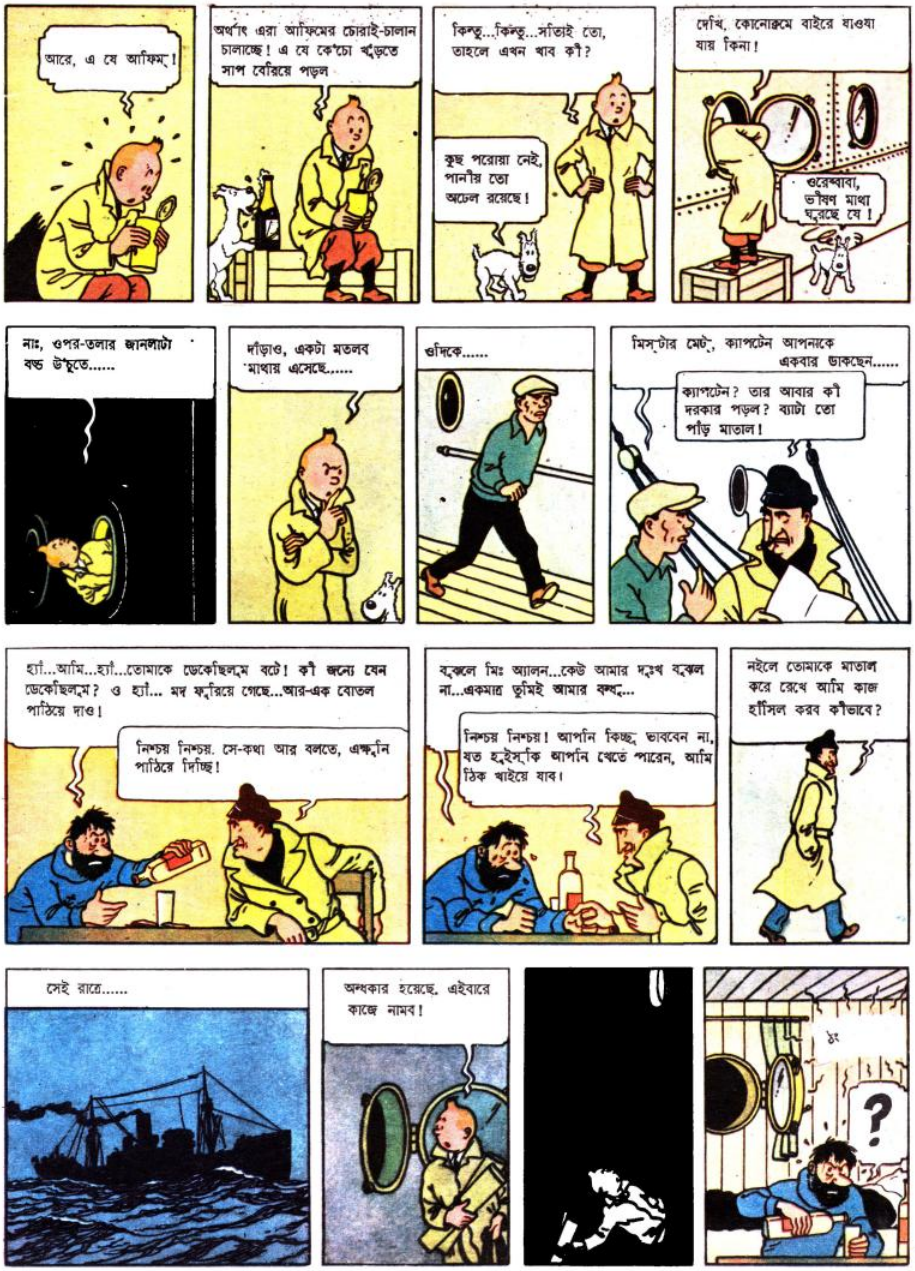
আরে, এ যে আফিম্!
অর্থাৎ এরা আফিমের চোরাই-চালান চালাচ্ছে! এ যে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ল
কিন্তু...কিন্তু...সত্যিই তো, তাহলে এখন খাব কী?
কুছ পরোয়া নেই, পানীয় তো অঢেল রয়েছে!
দেখি, কোনোক্রমে বাইরে যাওয়া যায় কিনা!
ওরেব্বাবা, ভীষণ মাথা ঘুরছে যে!
নাঃ, ওপর-তলার জানলাটা বড্ড উঁচুতে.....
দাঁড়াও, একটা মতলব মাথায় এসেছে.....
ওদিকে.....
মিস্টার মেট্, ক্যাপটেন আপনাকে একবার ডাকছেন.....
ক্যাপটেন? তার আবার কী দরকার পড়ল? ব্যাটা তো পাঁড় মাতাল!
হ্যাঁ...আমি...হ্যাঁ...তোমাকে ডেকেছিলুম বটে! কী জন্যে যেন ডেকেছিলুম? ও হ্যাঁ... মদ ফুরিয়ে গেছে...আর-এক বোতল পাঠিয়ে দাও!
নিশ্চয় নিশ্চয়, সে-কথা আর বলতে, এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি!
বুঝলে মিঃ অ্যালন...কেউ আমার দুঃখ বুঝল না...একমাত্র তুমিই আমার বন্ধু...
নিশ্চয় নিশ্চয়! আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, যত হুইস্কি আপনি খেতে পারেন, আমি ঠিক খাইয়ে যাব।
নইলে তোমাকে মাতাল করে রেখে আমি কাজ হাঁসিল করব কীভাবে?
সেই রাত্রে.....
অন্ধকার হয়েছে. এইবারে কাজে নামব!
?

নানান দেশের

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কাক আর গলদা চিংড়ি

ইউক্রেনের গল্প

একদিন এক কাক সমুদ্দুরের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, হঠাৎ নিচে তাকিয়ে দেখতে পেলে এক গলদা চিংড়ি। অমনি গোঁ করে কাক সটান নেমে এলো নিচে, এক ছোঁ, তারপরেই খপ্ ক'রে তার ঠোঁটে তুলে নিলে গলদা চিংড়িকে। যাক, আজকের মতো খাওয়ার সমস্যাটা মিটলো। এবার জঙ্গলে বাসায় গিয়ে দিব্যি শান্তিতে বসে তারিয়ে তারিয়ে চিংড়ি মাছ চিবুনো যাবে।

চিংড়ি তো তাকিয়ে দ্যাখে, তার বর্তমান আর ভবিষ্যৎ সবই কুচকুচে কালো। এখন সে কি করে?

'বায়স মশাই! একটু পরে সে কাককে খুব বিনীতভাবে বললে, 'আপনার বাবা-মার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিলো। অতীব চমৎকার বায়স তাঁরা —খুবই সজ্জন।'

কাক কিছু বললে না। ও-সব চালাকি সে খুব জানে। কথা বলতে গিয়ে সে ঠোঁট খুলুক, আর চিংড়িকে হারাক, অত বেকুব সে নয়।

'হ্যাঁ, আর মনে পড়লো। আপনার ভাইবোনদেরও আমি চিনতুম। কি মধুর ব্যবহার তাঁদের—আলাপ হওয়া মানেই একেবারে ভালোবাসা হওয়া!'

কাক শুনলো, কিন্তু কিছুই বললো না।

'আঁবশ্যি যদি জ্ঞানবুদ্ধি আর মধুর ব্যবহারের কথা বলেন, তো আপনার সঙ্গে আর কার তুলনা? আমি তো বন্ধুদের প্রায়ই বলি : বায়সমশায়ের চেয়ে জ্ঞানীগুণী আর সহৃদয় ব্যক্তি কি কোথাও পাওয়া যাবে!'

'সত্যি?' কাক জিগেশ করলে। আর অমনি চিংড়ি গিয়ে পড়লো সমুদ্দুরে —অমনি ডুব, এবং নিরাপদ।

কার শক্তি বেশি

ভিয়েতনামের গল্প

কার শক্তি সবচেয়ে বেশি?

সে কি রাজা? তা সাঁতা, তাঁর তো কত ক্ষমতা। চোর ধ'রে তিনি তাকে সাজা দেন : জেলে পোরেন কিংবা শূলে চড়ান।

কিন্তু চোরেরও ক্ষমতা কিছু কম নয়। মুরগি চুরি ক'রে তাকে কেটে-কুটে ভালো ক'রে রান্না ক'রে বেশ তারিয়ে-তারিয়ে খেয়ে নেয়।

আর মুরগি? সে তো কেবল খুঁট-খুঁট ক'রে বেড়াচ্ছে : ঠোঁট দিয়ে খুঁটে-খুঁটে সে মুখে পুরে দেয় ঘুণপোকা : এক ঢোকেই পোকা তার পেটে।

আর ঘুণপোকা? ঘুণ, ঘুন, ঘুন ..একটানা আওয়াজ হয়, যেন কেউ তুরপুন চালাচ্ছে। একটানা আওয়াজ হয় যখন সে সেধোয় রাজার সিংহাসনে; তারপর একদিন পায়া ভেঙে সিংহাসন পড়ে দড়াম, আর রাজা আছাড় খান মাটিতে। শব্দ হয়, খুব শব্দ হয়।

কিন্তু কাকে তোমার মনে হয় সবচেয়ে শক্তিশালী : সে কি রাজা? না কি চোর? না কি মুরগি? না কি এইটুকু এক ঘুণপোকা?

হাবা চোর

চীনের গল্প

এক ছিলো চোর। চোর, কিন্তু হাবার হদ্দ। অত বড়ো বোকা দেশ-বিদেশে কেউ কখনো চোখেই দ্যাখেনি।

তা এই বেকুব চোরটি একদিন ঠিক করলে যে তার পড়শির বাড়ির দরজায় ঘণ্টাটা চুরি করবে। কেমন মস্ত ঘণ্টা, ঢং ঢং ক'রে কেমন সুরেলা বাজে!

কাজেই একরাতে পা টিপে-টিপে সে পাশের বাড়ির দরজার কাছে গিয়েই ঘণ্টার দড়ি ধ'রে দিলে এক হ্যাঁচকা টান! বাস, অমনি ঢং ঢং ক'রে সেকি পাগলা ঘণ্টি। সাত মাইল দূর থেকেও বুঝি সে-আওয়াজ শোনা গেলো। চোর বেচারা আঁৎকে উঠে তিন লাফে পেছিয়ে এলো।

নাঃ। ভয়টা একটু কমতেই চোর ভাবলে, উঁহু, এভাবে হবে না। ঘণ্টাটা এমনভাবে ঢংঢং ক'রে ওঠে যে আমারই বুকটা ধড়াশ ক'রে লাফিয়ে ওঠে। তার চেয়ে বরং কানে তুলো গুঁজে দিই। তাহলেই ঐ চনচনানি আর শুনতে হবে না।

সে তো মহা সাবধানে কানে তুলো-টুলো গুঁজে আবার পড়শির দরজার কাছে গিয়ে হাজির। এদিক-সেদিক-ইতি-উতি তাকিয়ে সে তারপর দিলে জোরসে গোটা দুত্তিন হ্যাঁচকা টান। দড়ি ছিঁড়ে ঘণ্টাটা পড়লো মাটিতে— আর যেই সে ঘণ্টাটা তুলে নিয়ে পিঠ-টান দেবে, তার পড়শি বেরিয়ে এলো

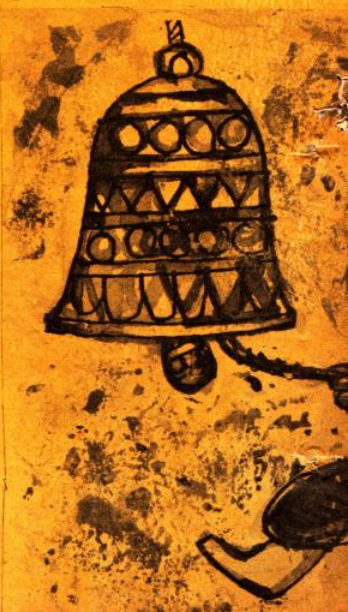

গল্প-সল্প

ছবি এঁকেছেন ॥ পূর্ণেন্দু পত্রী

টান দেবে, তার পড়শি বেরিয়ে এলো ভিতর থেকে—এই তুলকালাম ঢং চঙা ঢং কেন জানতে।

তা চোর তো অতঃপর গেলো জেল-খানায়। তার সবটাই মনে হ'লো বুঝি ভাবীকালের অবিচার—নইলে যেই কিনা সে ব্যাপারটা মোটামুটি ম্যানেজ ক'রে এনেছে, ঠিক সেই সময়টায় তার পড়শি এসে হাজির হবে কেন?

'আমার কপালটাই খারাপ,' জেল-খানায় ঘানি ঘোরাতে-ঘোরাতে চোর বেচারা রোজ কেবল গোঙায়।

ইঁদুর বনাম মশা

সারবিয়ার গল্প

অনেক, অনেকদিন আগে ইঁদুরদের হাতে থাকতো ধারালো তলোয়ার আর মশাদের হাতে চোখা ফলাওলা বল্লম। তা অস্ত্রশস্ত্র হাতিয়ার-টাতিয়ার দিয়ে কিই বা হয়, যদি না তা কাজে লাগানো যায়? কাজেই একদিন লেগে গেলো যুদ্ধমার কাণ্ড—ইঁদুর আর মশায় সে কি ভয়ানক মার-মার কাট-কাট লড়াই!

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়... বছরের পর বছর। লড়াই আর থামে না; শেষটায় এই একঘেয়ে লড়াই দেখে-দেখে সবাই ভারি বিরক্ত হ'য়ে উঠলো। কাঁহাতক আর রোজ-রোজ সব কাজকাণ্ড পণ্ড ক'রে এই মার-মার যুদ্ধমার সইতে পারা যায়! সবাই বললে যে, নাঃ, এবার যে-ক'রেই হোক লড়াইটা থামানো উচিত। কিন্তু থামাবে কে? আর কেমন ক'রেই বা থামাবে? এ-দলে নেই, ও-দলে নেই, এমন লোকদের নিয়ে তাহলে একটা কমিশন বসানো হোক: এই কমিশনই সব খতিয়ে দেখবে, নিরপেক্ষ মতামত দেবে, যুদ্ধের একটা নিষ্পত্তি হবে, একটা মীমাংসা। কাজেই ইঁদুররা ডেকে পাঠালে সোয়ালো পাখিদের, আর মশারা বেরালদের।

'এই যে! শুনি, মৎলবটা কি?' ইঁদুররা শোরগোল তুললো।

'যাঃ রে!' মশা গুণগুণে করে বললে, 'আমরা তো বেরালদের ডাকছি—কমিশনের সভ্য হ'তে। তা এতে আপত্তিটা কি, শুনি? দোষটা হলো কোথায়!'

'দোষ হলো কোথায়? তা আবার জিগেশ করতে হয়? ঐ বেরালগুলো তো কেবল তদন্ত করেই দেখবে না, শেষটায় জল্লাদ হ'য়ে আমাদের মুণ্ডু-গুলো ছেঁচবে!'

'তা তোমরা কাদের নেমন্তন্ন করেছো, শুনি?' মশারা জিগেশ করলে।

'আমরা কিন্তু এ-সব ব্যাপারে খুব সাবধান। এমন লোকদের ডেকে পাঠি-য়েছি যারা হুলোগুলোর মতো অত ধদমায়েশ নয়। আমরা ডেকেছি সোয়া-লোদের।'

'কাকে?' মশারা ভনভন করে উঠলো।

'বললুমই তো...সোয়ালোদের।'

'বাস। আর দেখতে হবেনা। দেখবা মাত্র আমাদের টপাটপ মুখে পুরে দেবে!'

'তা আমরা দু-দলে একমত হয়ে যদি একটা কমিশনই না গড়তে পারি তো শেষ অব্দি চেষ্টাচরিত্তির ক'রে নিজেদেরই তবে একটা মীমাংসায় পৌঁছুতে হবে।'

অতঃপর অনেক তক্কাতক্কির পর তাদের যুদ্ধ থামলো। একদল ফেলে দিলে তলোয়ার, অন্যদল তাদের বল্লম। কিন্তু ইঁদুরদের রাঁয়ে গেলো দাঁত, আর মশাদের হুল। বিপদটা তারপর থেকে যাচ্ছে মানুষেরই!

উট আর পিঁপড়ে

আরবের গল্প

এক সবুজ মাঠ, তাতে চরে বেড়াচ্ছিলো এক উট। হঠাৎ এক সময় তার নজরে পড়লো এক ব্যস্তসমস্ত পিঁপড়ে। ছোট্ট পিঁপড়ে, খুবই ছোট্ট; কিন্তু তবু সে তার নিজের চেয়ে দশগুণ বড় এক খড়ের টুকরো নিয়ে পিলপিল করে চলেছে। ভারি ব্যস্ত, যেন তার দম ফেলবারও ফুরসৎ নেই।

তাকে অত কাজ করতে দেখে উট তো একেবারে তাজ্জব: এইটুকুন এক পিঁপড়ে, আর তার অত বড়ো বোঝা!

'ভাই পিঁপড়ে,' উট বললে, 'বাসরে, তুমি দেখছি হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটেছো—সব সময়েই তো তোমাকে ব্যস্ত দেখি! তোমার নিজের চেয়ে দশগুণ বড়ো একটা খড়—তাই নিয়েই তুমি দিব্যি যাচ্ছো—তোমাক একটুও ক্লান্ত দেখাচ্ছে না। এদিকে আমি তো একটামাত্র বস্তার ভরেই কেমন কাবু হয়ে পড়ি! তুমি কেমন করে পারো?'

পিঁপড়ে কেবল এক ঝলক, থমকে দাঁড়ালো।

'এ আর বেশি কথা কি', পিঁপড়ে তাকে বললে, 'খুবই সোজা। আমি কাজ করি নিজের জন্য,—আর তুমি করো গোলামি—তুমি কাজ করো তোমার মালিকের জন্য।' বলেই পিঁপড়ে তার বোঝা নিয়ে পিলপিল ক'রে তার নিজের পথে চ'লে গেলো।

আর-একবার চেষ্টা করে দেখি!
কেউ তো নেই! তাহলে?
নেশার ঘোরে ভুল দেখছি না তো?
খবর্দার! কাউকে ডাকলেই গুলি করব!
তুমি...তুমি আবার কে হে?
এই বিচ্ছিরি জাহাজের একজন বন্দী...
বিচ্ছিরি? খবর্দার...আমি.. আমি—ক্যাপটেন হ্যাডক! আমার জাহাজকে বিচ্ছিরি বললে আমি ভীষণ রেগে যাই!
তাতে আমার বয়েই গেল! আফিমের চোরাই-ব্যবসা চালাচ্ছেন, আপনার লজ্জা করে না?
আফিম? আমার জাহাজে? বলো কী?
কেন, আপনি জানেন না?
সত্যিই জানি না! দ্যাখো ব্যাপার! শেষকালে কিনা আমার মতো সৎ লোকের জাহাজে চোরাই আফিম! এ নিশ্চয় ওই হতচ্ছাড়া অ্যালানের কাণ্ড!

এরপর আগামী সংখ্যায়

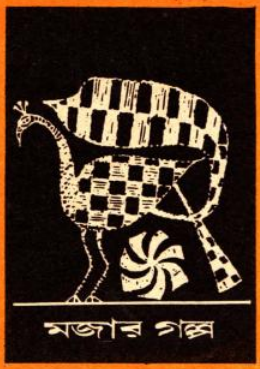

হুপা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সেবারে আমরা রামপুরহাট বেড়াতে গিয়েছিলাম। স্টেশন থেকে পাঁচ ছ'মাইল দূরে একটা বড় ইস্কুল আছে। তখন পুজোর ছুটি, অত বড় ইস্কুল বাড়িটা ফাঁকা, হস্টেলেও একটিও ছাত্র নেই।

আমাদের এক বন্ধু জীবনময় ঐ ইস্কুলের ইতিহাসের মাস্টার। সে আমাদের চিঠি লিখেছিল, পুজোর সময় এদিকে বেড়াতে চলে এসো না। জায়গাটা খুব চমৎকার, খুব ভালো পুঁই শাক আর সজনে ডাঁটা পাওয়া যায়। আর রামপুরহাটের বেগুন তো বিখ্যাত। আমাদের ঠাকুর খুব ভালো ঝিঙে পোস্ত রান্না করে। অবশ্য এখানকার মুরগিগুলোও বেশ মোটা-সোটা। আর থাকার জায়গারও কোনো অসুবিধে নেই। এক একজন দু'তিন খানা করে ঘর নিয়ে শুতে পারে।

চিঠি পেয়েই আমি, রতন আর অসীম আর তার বউ জয়া আর ওদের ছেলেমেয়ে ভুটানি আর বাবুয়া রওনা হয়ে পড়লুম। আমরা আগে কেউ রামপুরহাট যাইনি, দেখেই আসা যাক জায়গাটা।

স্টেশনে নেমেই আমরা একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম। মোটরগাড়ি যখন প্রথম আবিষ্কার হয়েছিল, ট্যাক্সিটা বোধ হয় সেই সময়কার। তার হর্ণ বাজে না। কিন্তু সারা গাড়িতেই এমন ঝকার ঝক্ হুড়ুম হাড়াম শব্দ হয় যে হর্ণের কোনো দরকারই নেই। ট্যাক্সিটা দেখলেই রাস্তার লোক দৌড়ে মাঠে নেমে যায় আর অন্য গাড়িগুলো অনেক দূরে থেমে পড়ে। মনে হয়, এখানে ট্যাক্সিটা বেশ বিখ্যাত।

আমাদের অবশ্য বেশ ভালো লাগছিল। ট্যাক্সিতে বসে লাফাতে লাফাতে যাচ্ছি। এক সঙ্গে ট্যাক্সি চড়া আর ঘোড়ায় চড়া হয়ে যাচ্ছে।

তখন বিকেলবেলা। গাড়িটা শহর ছাড়াবার পরেই রাস্তার দু'পাশের দৃশ্য বেশ সুন্দর। অনেক দূর পর্যন্ত ঢেউ খেলানো মাঠ। ঠিক পাহাড় নেই, তবে অনেকটা পাহাড় পাহাড় ভাব। লাল রঙের পাথরের ঢিবি, আর মাঝে মাঝে বিরাট বিরাট গাছ। আর আকাশটাকে বেশ জমকালো করে সূর্য ডুবছে। ঠিক যেন একটা ছবি। অর্থাৎ চুলকাটার সেলুনের ক্যালেন্ডারে যে-রকম ছবি থাকে, ঠিক সেইরকম।

আমরা মুগ্ধ হয়ে সেই ছবি দেখছিলাম, ইতিমধ্যে ট্যাক্সিওয়ালা আমাদের ভুল রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছিল। সে আমাদের নিয়ে যাচ্ছিল তারাপীঠে। এখানে নাকি সবাই তারাপীঠের মন্দির দেখতে আসে। আমরা স্কুলে যাবো শুনে সে তো খুব অবাক। ছুটির সময় আবার কেউ ইস্কুলে যায় নাকি?

যাই হোক, কোনো রকমে তো পেঁছোনো গেল। ইস্কুলের গেটেই দাঁড়িয়েছিল জীবনময়। হাতে একটা বিরাট লম্বা লাউ, ঠিক একটা গদার মতন। আমাদের দেখে এক গাল হেসে বললো, তোরা আসবি বলে এক্ষুনি এই লাউটা কিনলুম।

রতন অমনি ধমক দিয়ে বললো, মোটেই আমরা লাউ কিংবা পুঁইশাক কিংবা সজনে ডাঁটা খেতে এখানে আসিনি। নিরামিষ খেলে আমার হেঁচকি ওঠে!

জীবনময় বললো, দু'কেজি বড় বড় চিংড়িমাছও কিনেছি অবশ্য!

অসীম বললো, লাউ-চিংড়ি জিনিসটা অবশ্য মন্দ নয়। কিন্তু মোটা মোটা মুরগিগুলো কোথায়?

জয়া বললো, একি, এসেই তোমরা খাওয়ার কথা শুরু করলে যে!

ভুটানি আর বাবুয়া ডন বৈঠক দিতে শুরু করেছে। ট্যাক্সির ঝাঁকুনিতে ওদের গায়ে ব্যাথা হয়ে গেছে। তারপরই ওরা এক ছুটে চলে গেল বাগানে।

জিনিসপত্র নিয়ে আমরা চলে এলাম হস্টেলে। বারোখানা ঘর। সব-গুলোই ফাঁকা। বেশ অনেকদিন বাদে আমাদের একটা ছাত্র ছাত্র ভাব এলো। আমরা ছাত্রদের খাটেই শোবো, তাদের চেয়ার-টেবিলেই বসবো। শুধু আমাদের পড়াশুনো করার জন্য তাড়া দেবার কেউ নেই।

হস্টেলের পাশেই বিরাট বড় মাঠ। অনেক রকম গাছপালাও রয়েছে।

ভুটানি আর বাবুয়া বেশ খানিকক্ষণ সেখানে হুটোপুটি করার পর ঝগড়া করতে করতে ফিরে এলো। ভুটানি আর বাবুয়ার বয়েস তেরো আর এগারো, কিন্তু ওরা মাঝেমাঝেই বড় ঝগড়া করে।

ট্রেনে আসবার সময় বাবুয়া একটা বাঁশের বাঁশী কিনেছিল। এখানে খেলতে খেলতে সেটা একবার একটা গাছতলায় রেখেছিল। আর খুঁজে পাচ্ছে না। সে বলছে, ভুটানি সেটা নিয়েছে।

আর ভুটানি বলছে, মোটেই আমি নিইনি। ঐ পচা একটা বাঁশী নিতে আমার বয়ে গেছে!

সে দু'হাত তুলে দেখালো, কোথায় বাঁশী? আমার কাছে আছে!

বাবুয়া বললো, তুই নিশ্চয়ই লুকিয়ে রেখেছিস কোথাও!

আমরা ওদের ঝগড়া থামালাম। সন্ধে হয়ে গেছে। আমি বললাম, কাল সকালে আমিই খুঁজে দেবো বাঁশীটা। বাগানেই নিশ্চয়ই কোথাও পড়ে আছে।

রাত্তিরে খাওয়া দাওয়া বেশ ভালোই হলো। হস্টেলের ঠাকুরটা ভাগ্যিস ছুটি নেয়নি। রান্না সে ভালোই করে। শুধু ডাল রাঁধতে জানে না। ডালের বাটিতে নেমে অনায়াসে সাঁতার কাটা যায়।

খাওয়ার আগে ছোট্ট একটা ঘটনা ঘটেছিল। আমরা তার মানে বুঝতে পারিনি। সন্ধের পর আমরা চা খাচ্ছিলাম। রতন ওর চায়ের কাপটা নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। আমরা ঘরের মধ্যে। চমৎকার ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। ইউক্যালিপটাস পাতার গন্ধ। রতন গান গাইছিল আপন মনে। একটু বাদে ঘরের মধ্যে ফিরে এলো। চায়ের কাপটা বারান্দাতেই রেখে এসেছে। সেটা মনে পড়তেই বারান্দায় ফিরে গিয়ে দেখলো, কাপটা নেই।

রতন চেঁচিয়ে বললো, আরে, আমার চায়ের কাপ কোথায় গেল?

আমরাও বারান্দায় গিয়ে খুঁজলাম। চায়ের কাপটা পাওয়াই গেল না।

জয়া বললো, নিশ্চয়ই আপনি কাপটা ভুল করে অন্য কোথাও ফেলে এসেছেন।

রতন বললো, না, এই তো রেলিং-এর ওপর রেখেছিলাম।

রেলিং-এর ওপর কেউ কাপ রাখে? নিশ্চয়ই নিচে পড়ে গেছে। আমরা সবাই মিলে বকলাম রতনকে। রতন নিচে গিয়েও দেখে এলো। সেখানে ভাঙা কাঁচের টুকরোও পড়ে নেই। তাহলে চায়ের কাপ কোথায় যাবে? অর্ধেক চা ভর্তি কাপ তো আর হাওয়ায় উড়ে যেতে পারে না। রতনের যা ভুলো মন। নিশ্চয়ই অন্য কোথাও রেখেছে কখন।

জীবনময় তখন শহরে গিয়েছিল কয়েকটা জিনিসপত্র কিনতে। সুতরাং কাপের ব্যাপারটা আমরা একটুবাদে ভুলে গেলাম।

এখানে কলের জল নেই। হস্টেলের বাইরে বেশ বড় একটা কুয়ো আছে। উঁচু করে পার বাঁধানো। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, মুখ ধোওয়ার জন্য কেউ বাইরে যেতে চায় না। কুয়ো থেকে বালতি ভরে ভরে জল আনা হতে লাগলো ভেতরে। আমিই কুয়ো থেকে জল তুলছিলাম। পরিশ্রম করলে শীত কেটে যায়।

জল তোলা শেষ হলে বালতি টালতি নিয়ে ভেতরে আসবার পর খেয়াল হলো চটিটা ফেলে এসেছি। ফিরে এসে দেখি চটি জোড়া অদৃশ্য হয়ে গেছে।

আমি বুঝে গেলুম, এটা রতনের কাণ্ড। খানিকটা আগে চায়ের কাপের জন্য ওকে বকেছি বলে ও আমার চটি লুকিয়েছে। ফিরে গিয়ে আমি কাউকে কিছু না বলে রতনের চটি নিজের পায়ে পরে নিলাম।

রতন একটুবাদেই বললো, এই, তুই আমার চটি পরেছিস কেন?

আমি বললাম, তুই আমার চটি কোথায় লুকিয়েছিস, দে!

—আমি তো তোর চটি নিই নি।

—কুয়োর ধার থেকে তুই যে আমার চটি পরে চলে এলি?

—না সত্যিই না।

তখন টর্চ নিয়ে আমরা দুজনে আবার গেলাম কুয়োর ধারে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও চটি পাওয়া গেল না।

রতন তখন চোখ গোলগোল করে বললো, একি ভূতুড়ে ব্যাপার নাকি? আমার কি রকম সন্দেহ হচ্ছে!

চাঁদ ওঠেনি, তাই ঘুটঘুটে অন্ধকার। চারদিক নির্জন। এর মধ্যে

ভূতের নাম করা মোটেই উচিত নয়।

আমি তবু সাহস সঞ্চয় করে বললাম, যাঃ ভূতে চটি নিয়ে কি করবে?

-তাহলে চটি জোড়া গেল কোথায়? এই মাত্র ছিল এখানে।

—কিন্তু ভূতে কখনো জুতো নেয়, তা শুনিনি! ভূতেরা তো জামা কাপড়ই পরে না। জামা কাপড় না পরে শুধু চটি কেউ পায় দেয়?

চটি পরা একটা ভূতের কথা চিন্তা করতেই আমার হাসি পেল। আমি বললাম, নিশ্চয়ই কুকুর-টুকুর এসে—

রতন বললো, আমার চায়ের কাপটাও কি কুকুরে নিয়েছে?

এমন সময় একটা হালকা বাঁশীর আওয়াজ শোনা গেল বাগান থেকে। কেউ যেন নতুন বাঁশী শিখছে।

রতন ভয় পেয়ে আমার হাতটা জড়িয়ে ধরে বললো, শুনতে পাচ্ছিস? বাবুয়ার যে বাঁশীটা হারিয়ে গিয়েছিল—

এবার আমারও একটু সন্দেহ হলো। কিন্তু রতনের কাছে সাহস দেখানো দরকার। তাই বললাম, চল্, বাগানটা খুঁজে দেখে আসি।

রতন কাঁপা কাঁপা গলায় বললো, জীবনময়কে ডাকি তাহলে?

আমি বললাম, ওকে ডাকতে হবে কেন? আমরা দু'জনে তো আছি, সঙ্গে টর্চ রয়েছে।

দু'জনে খুব ঘেঁষাঘেঁষি করে বাগানটা ঘুরে দেখলাম। কোথাও কেউ নেই। বাঁশীর শব্দটাও থেমে গেছে। টর্চের আলোয় এক সময় দেখতে পেলাম, একটা গাছের তলায় বাবুয়ার বাঁশীটা পড়ে আছে। মাঝখান থেকে ফাটা, সেটা থেকে শব্দ বেরুবার কথা নয়।

দু'জনে ছুটতে ছুটতে ফিরে এলাম হস্টেলে। রতন সোজা জীবনময়ের সামনে দাঁড়িয়ে বললো, এখানে ভূত আছে, আমাদের বলিস নি কেন?

জীবনময় অবাক হয়ে বললো, ভূত! ভূত আবার কি?

—আলবৎ এখানে ভূত আছে।

--তোদের মাথা খারাপ। এই হস্টেলে আটচল্লিশজন ছাত্র থাকে। তাদের সামনে ভূত তো দূরের কথা ব্রহ্মদৈত্যও আসতে সাহস করবে না। আজকালকার ছাত্রদের তো চিনিস না!

রতন তবু বললো, তাহলে সুনীলের চটি, আমার চায়ের কাপ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে কি করে?

বাবুয়া আর ভুটানি ভূতের কথা শুনেই চ্যাঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। আর জীবনময় হো-হো করে হাসছে। এরকম সময় হাসি কারুর ভালো লাগে?

এক সময় হাসি থামিয়ে জীবনময় বললো, সত্যি, হুপার কথাটা তোমাদের আগেই বলে দেওয়া উচিত ছিল।

আমরা তিন চারজন মিলে একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, হুপা? হুপা আবার কে?

জীবনময় বললো, সে একটা সাঙ্ঘাতিক চোর। তার জ্বালায় এখানকার সব লোক অস্থির।

চোরের কথা শুনে সকলের ভূতের ভয় কমে গেল। বাবুয়া বললো, চোরটাকে পুলিশে ধরতে পারে না?

জীবনময় বললো, ধরবে কি করে, তাকে দেখতেই পাওয়া যায় না! সে যে কখন আসে আর কখন যায়, কেউ টের পায় না। তবে, সে খুব বড় কিছু কিংবা দামী কোনো জিনিস এখনো চুরি করেনি। তাই সব সময় লোকে পুলিশে খবরও দেয় না!

বলতে বলতেই জীবনময় ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়ালো। ব্যস্ত হয়ে বললো, কুয়োতলায় বালতি ফেলে আসোনি তো? তাহলে এতক্ষণ গেছে।

সবাই মিলে কুয়োতলা ছুটলাম। অন্য বালতিগুলো ভেতরে আনা হয়েছিল। কিন্তু যে-বালতি দিয়ে জল তোলা হয় সেটা দড়ির সঙ্গে বাঁধাই ছিল। গিয়ে দেখি সেটা হাওয়া হয়ে গেছে!

রাত্তিরে আমরা জানলা দরজা বন্ধ করে শুয়ে রইলাম। সকালে উঠে দেখা গেল আর কিছু চুরি যায়নি।

চা-টা খেয়ে আমরা বেড়াতে বেরুলাম। কাছেই একটা ছোট নদী আছে। বেশ টলটলে জল। একটু দূরে দূরে গ্রামও রয়েছে কয়েকটা। সেরকম একটা গ্রাম পেরুলেই পশ্চিম বাংলা শেষ হয়ে বিহার। বাবুয়া আর ভুটানি ছুটে ছুটে একবার পশ্চিমবাংলা একবার বিহারে আসা যাওয়া করতে লাগলো। তাই দেখে রতন বললো, একেই বলে আন্তঃ রাজ্য দৌড় প্রতিযোগিতা!

ফিরে এসে শুনলাম, আমাদের জন্য যে দুটি মুরগি কিনে রাখা হয়েছিল, সে দুটোই চুরি হয়ে গেছে। রান্না ঘরের বারান্দায় একটুক্ষণের জন্য মুরগি দুটোকে রেখে ঠাকুর ভেতরে গিয়েছিল একটা গামলা আনতে, সেই ফাঁকেই হুপা এসে সে দুটো নিয়ে গেছে।

সেই দুপুরে বাধ্য হয়ে আমাদের নিরামিষ খেতে হলো বলে আমরা হুপার ওপর সত্যিই খুব রেগে গেলাম।

খেয়ে দেয়ে দুপুরে ঘুম দিয়ে বিকেলে জেগে ওঠার পর হুপার আর এক কীর্তি দেখা গেল। জয়া বাইরের দাঁড়িতে ছেলেমেয়েদের জামা প্যান্ট আর নিজের একটা শাড়ী কেচে শুকোতে দিয়েছিল। সে সব তো গেছেই, এমনকি দাঁড়িটা পর্যন্ত নেই!

অসীম এবার রেগে গিয়ে জীবনময়কে বললো, এ কোন জায়গায় নিয়ে এলি আমাদের? চোরের রাজত্ব একটা!

জীবনময় বললো, না ভাই এখানে আর কোনো চোর নেই, শুধু হুপার উৎপাতেই নতুন লোকেরা জব্দ হয়ে যায়।

—কেন, হুপা বুঝি পুরোনো লোকদের জিনিস চুরি করে না?

—না, তা নয়। আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে। আমরা কোনো কিছুই বাইরে রাখি না। হুপার কিন্তু একটা গুণ আছে। সে কক্ষণো ঘরে ঢুকে কিছু চুরি করে না। তুমি ঘরের দরজা খুলে রাখো, ভেতরে যতই দামী জিনিস থাক—সে হাত দিতে সাহস করবে না।

রতন ধমক দিয়ে বললো, থাম, চোরের আবার গুণ! এখানকার পুলিশ কি এতই অপদার্থ যে একটা চোরকেও ধরতে পারে না?

জীবনময় বললো, শুনেছি, অনেকদিন আগে ধরা পড়েছে দু' একবার। কিন্তু ছিচকে চুরি তো, দু মাস তিন মাস জেল খেটে বেরিয়ে আসে, আবার চুরি করে। লোকটার দেখা পাওয়াই খুব শক্ত। তুম্বুনি গ্রামে ওর বাড়িও আছে, সেখানে গিয়েও ওকে ধরা যায় না। একবার হস্টেলের ছেলেরা ওকে রাত্তির-বেলা প্রায় ধরে ফেলেছিল। তাও হাত ফসকে পালালো। দৌড়ে গিয়ে একটা পুকুরে লাফিয়ে পড়লো, তারপর আর দেখাই গেল না।

—ওকে কিরকম দেখতে?

—রোগা, ছোট্খাট্টো চেহারা, কাঁধে একটা ঝোলা।

এর পরের দু দিনে আমাদের দু'জোড়া চটি, তিনটে গেঞ্জি, ভুটানির চুলের ফিতে, বাবুয়ার ক্রিকেট ব্যাট, জয়ার চিরুনি—চুরি হয়ে গেল। কোনো জিনিস ভুল করে একটুও বাইরে ফেলে রাখার উপায় নেই। কোথায় যে লুকিয়ে থাকে লোকটা। টুক করে জিনিসটা নিয়েই অদৃশ্য হয়ে যায়।

বাবুয়া আর ভুটানি তো দারুণ ক্ষেপে উঠলো। তারা ঠিক করলো,

চোরটাকে ধরবেই! বাবুয়া কখনো চোর দেখেনি, তার হুপাকে দেখার দারুণ উৎসাহ। অনেক সময় ওরা ইচ্ছে করে বাগানে কোনো জিনিস ফেলে এসে আড়ালে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকে। তখন কিন্তু হুপা আসে না। সেও কম চালাক নয়।

রাস্তায় ঘাটে কোনো রোগা আর ছোট্টখাট্টো চেহারার লোক দেখলেই আমাদের সন্দেহ হয়। সেরকম কোনো লোককে যখন আমরা সন্দেহ করছি, তখনই হয়তো হুপা অন্যদিক থেকে এসে আমাদের আর একটা জিনিস চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে।

দিন সাতেকের মধ্যে হুপা সত্যিই আমাদের জব্দ করে দিল। কিছুতেই আমরা তাকে একবার দেখতেও পেলুম না, অথচ সে সমানে আমাদের জিনিস-পত্র নিয়ে পালাচ্ছে। অন্ধকার হলেই মনে হয়, যে-কোনো গাছের আড়ালেই বোধহয় থলে ঘাড়ে করে হুপা ঘাপটি মেরে বসে আছে। কোনো জিনিসে তার অরুচি নেই। কয়লাভাঙা হাতুড়িটাও সে বাদ দেয় না।

দু'দিন বাদে আমাদের ফিরতে হবে। বাবুয়ার বেশী আফশোস, সে হুপাকে একবার, অন্তত একবার দেখতেও পেলে না। এত কাছে এসেও একটা চোর দেখা গেল না।

সেদিন সকালে আমরা গ্রামের দিকে বেড়াতে গেছি। জীবনময় বললো, এই গ্রামেই হুপার বাড়ি। সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই বললাম, দেখতে যাবো! জীবনময় বললো, তাকে কিছুতেই বাড়িতে পাবে না। আমরা বললাম, তা হোক্।

একটা পুকুর ধারে একটা বাঁশের চ্যাচাড়ির তৈরি বাড়ি। তাও ভাঙাচোরা। বাড়ির পাশের লাউমাচার কাছে খুব ছেঁড়া কাপড় পরা একজন মেয়েলোক দাঁড়িয়ে। জীবনময় বললো, ঐ হুপার বৌ। ধুলোয় বসে দুটো ছেলেমেয়ে বিচ্ছিরি গলায় কাঁদছে। ওরা হুপার ছেলেমেয়ে। তাহলে হুপা নামে সত্যিই একজন কেউ আছে। চোর দেখা হলো না বটে, কিন্তু চোরের বাড়িটা দেখা হয়ে গেল।

বাবুয়া জিজ্ঞেস করলো, ছেলেমেয়ে দুটো কাঁদছে কেন?

আমরা কেউ কোনো উত্তর দিলাম না। বাবুয়া বললো, চোরটা কি পাজী, আমার খেলনাগুলো চুরি করে এনেছে, তাও নিজের ছেলেমেয়েদের খেলতে দেয়নি। তা হলে চুরি করে কেন ও?

ফেরার সময় দেখলাম, রাস্তা দিয়ে একজন মোটা মতন লোক ঢোল বাজাতে বাজতে কি যেন বলছে। মন দিয়ে শুনলাম, সেদিন হাটে গভর্নমেণ্টের দুটো আলমারি নিলাম হবে, সেই কথা জানাচ্ছে। গ্রামের দিকে নিলামের খবর এইভাবে জানায়।

রতন হঠাৎ বললো, আচ্ছা, হুপাকে আমাদের বাড়িতে একবার নেমন্তন্ন করলে হয় না? আমরা ওকে কিছু বলবো না, পুলিশেও ধরাবো না। শুধু দেখবো। চোরটা কিন্তু সত্যিই মজার!

বাবুয়া আর ভুটানি লাফিয়ে উঠলো, হ্যাঁ, আমরা দেখবো, আমরা দেখবো।

জীবনময় বললো, কিন্তু তাকে পাওয়া যাবে কোথায়? ওর বাড়িতে কিছু বলে লাভ নেই। দুদিন তিনদিন হয়তো বাড়িই ফেরে না!

রতন বললো, আমি সে ব্যবস্থা করছি। রতন সেই ঢোলওয়ালাকে ডেকে কিছু বলে এলো। টাকাও দিল দুটো। তারপর থেকে সেই ঢোলওয়ালা চাচিতে লাগলো, আজ রাতে ইস্কুল বাড়িতে হুপার নেমন্তন্ন, বাবুয়া তাকে খাওয়াবেন। তার কোনো ভয় নাই। সে পেট ভরে খাবে। গোপনতা রক্ষা করা হবে! বাবুয়া ভাত ডাল মাছ মাংস আর এক খিলি পান খাওয়াবেন।

সেদিন সন্ধের পর থেকেই হুপার নেমন্তন্নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হতে লাগলো। বাবুয়া আর ভুটানি দুপুর থেকেই কয়েকটা বড় বড় কাগজে লিখেছে, হুপা, আজ তোমার নেমন্তন্ন, তোমাকে মারা হবে না, বকা হবে না, জিনিস ফেরৎ চাওয়া হবে না। এসো কিন্তু! তারপর সেই কাগজগুলো আটকে দিয়েছে কয়েকটা গাছে।

চোর একটু বেশী রাত্রেই আসবে ভেবে আমরা নিজেদের খাওয়া দাওয়া আগে সেরে নিলাম। তারপর থালা-বাটিতে হুপার খাবার সাজিয়ে রেখে দিলাম একতলার বারান্দায়। হুপা ঘরের মধ্যে ঢোকে না বলে বারান্দাতেই তার

খাবার রাখতে হলো। আমরা সবাই মিলে বসে রইলাম ঘরের চৌকাঠে।

রাত বাড়তে লাগলো, হুপা আর আসে না। তিনখানা গ্রামে ঢোল পিটিয়ে জানানো হয়েছে, হুপা খবর পেয়েছে নিশ্চয়ই। সে কি আমাদের বিশ্বাস করতে পারবে না?

ভুটানি আর বাবুয়া ছড়া বানিয়ে সুর করে বলতে লাগলো, আয়, আয়, হুপা আয়! ভাত দেবো, মাছ দেবো, পিঁড়ি পেতে বসতে দেবো, গেলাস ভরে জল দেবো, বাটি ভরে মাংস দেবো, মিঠে পাতা পান দেবো, আয় আয় হুপা আয়!

হুপা আর আসে না। দশটা, এগারোটা, এমনকি বারোটা পর্যন্ত বেজে গেল, তবু হুপা এলো না। চোরটা তো আচ্ছা নেমকহারাম! অসীম, জয়া আর জীবনময় রাগ করে শুতে চলে গেল। বাবুয়া আর ভুটানি জেদ করে বসে থাকলেও আর বেশীক্ষণ জাগতে পারলো না। ঘুমিয়ে পড়লো সেখানেই। আমি আর রতন বসে বসে গল্প করতে লাগলাম। একসময় সব গল্পও ফুরিয়ে গেল।

কখন দুজনেই যে ঝিমিয়ে পড়ে ছিলাম তা খেয়াল নেই। হঠাৎ জেগে উঠেই চমকে উঠলাম। থালা বাটি গুলো সব খালি। কাছে গিয়ে দেখলাম সব কিছু চেটে পুটে কে যেন খেয়ে গেছে। মানুষই নিশ্চয়ই, নইলে ঐরকমভাবে থালা বাটি পরিষ্কার হয় না। কতটুকু সময় মাত্র আমরা ঝিমিয়েছিলাম, তারই মধ্যে হুপা এসে খেয়ে গেছে!

থালা বাটি গুলোও যে সে নিয়ে যায়নি, সেটাই অবাক কাণ্ড। তাতেই বুঝলাম, আজ সে চুরি করতে আসেনি, নেমন্তন্ন খেতেই এসেছিল। নেমন্তন্ন খেয়ে কেউ থালাবাটি সঙ্গে নিয়ে যায় না, সেইটুকু জ্ঞান আছে। তবে বোধহয় বড্ড লাজুক, আমাদের চোখের সামনে খেতে চায়নি।

তারপর যে আমরা আর একটা দিন ছিলাম ওখানে, সেদিন আর আমাদের কোনো কিছুই চুরি যায়নি! তখন আমরা সবাই ঠিক করলাম, এরপর কোথাও বেড়াতে গেলে প্রথমেই চোরকে নেমন্তন্ন খাওয়াতে হবে। চোররাও ভদ্রতা জানে!

ছবি এঁকেছেন ॥ সুধীর মৈত্র

ম্যাজিক যাদুকর পি. সি. সরকার জুনিয়র

জাপানের ইয়োকোহামা শহরে আমার এক বন্ধু আছে, তার নাম মাসাহারু। সাধারণ জাপানীদের মতো চেহারা হলেও সে অন্যান্য জাপানীদের থেকে অনেক লম্বা। আমি তাকে জিজ্ঞেসই করে ফেলেছিলাম—'তোমরা অন্যান্য সবার থেকে লম্বা হলে কি করে?' সে মুচকি হেসে বলেছিল—'পাউরুটি খেয়ে।' আগে তোমাদের মতো বাঙালীদের মতো শুধু ভাতই খেতাম। গত কয়েক দশক ধরে 'গম' আমাদের দেশে ভাতের চেয়েও বেশী পপুলার হয়েছে। আমাদের বৈজ্ঞানিকদের হিসেব অনুযায়ী এই 'গম' খাবার পর থেকে এ দেশের নতুন জেনারেশনের সবাই অন্তত পক্ষে এক ইঞ্চি লম্বা হয়েছি।'

মাসাহারু কিন্তু আমার সাধারণ বন্ধু নয়। কয়েকটি বিশেষ বিশেষ গুণের অধিকারী সে। যেমন ধরো সে খুব ভালো ব্যালে নাচতে পারে, জাপানী কবিতা আবৃত্তি করতে পারে, এবং শুধু তাই-ই নয়, খুব ভালো 'জুডো' জানে। ওর সঙ্গে প্রথম আলাপ হওয়ার পর থেকে ও আমার কাছে জুডোর শিক্ষক হয়ে গেছে সময় পেলেই আমি তার কাছে জুডো শিখতাম। তবে হ্যাঁ, শিক্ষাটা একেবারে বিনা পারিশ্রমিকে নয়। তার বিনিময়ে আমাকে ম্যাজিক শেখাতে হোত। জাদুর বিনিময়ে জুডো। আমার কাছে সে জুডো-গুরু; আর তার কাছে আমি জাদু-গুরু।

মনে আছে, প্রথমদিন জুডো শেখবার পর সে আমায় ধরে বসলো এমন একটা ম্যাজিক শেখাতে যার মধ্যে আত্মরক্ষার ছোঁয়া আছে। আমি বললাম, 'খুলে বলো কি ধরনের ম্যাজিক?' সে হাত পা নেড়ে বলতে লাগলো—'এই যেমন ধরো এমন একটা কৌশল, যা দিয়ে ভাঙা জিনিষ জোড়া যায় অথবা কোন জিনিষ নষ্ট করতে চাইলেও নষ্ট হবে না—এই জাতীয়।'

আমি পড়লাম মহা ফাঁপড়ে। নষ্ট করলেও নষ্ট হয় না—তা আবার হয় নাকি! একটু চিন্তা করতেই আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো।

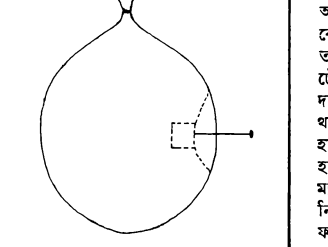

একটা বেলুন ফুলিয়ে তার কাছে এনে আমি বললাম, এর মধ্যে একটা পিনের খোঁচা দিলে কি হবে তুমি নিশ্চয়ই জানো। সে বললো—'হ্যাঁ, ফট্ করে বেলুনটা ফেটে যাবে।'

আমি বললাম—'কিন্তু যদি আত্মরক্ষার ম্যাজিক জানা থাকে তাহলে পিনের খোঁচা দিলেও এটা ফাটবে না।' সে বললো 'তাই নাকি! দেখাও তো।'

আমি তখন করলাম কি—পকেট থেকে একটা লম্বা পেরেক বের করে তাতে একটু ফুঁ দিলাম, তারপর এক-দুই-তিন বলেই বেলুনটার মধ্যে পট্ করে পিনটা ফুটিয়ে দিলাম। পেরেকটার অর্ধেকটা বেলুনের ভেতর ফুটে-টুকে রইলো। কিন্তু অবাক কাণ্ড! বেলুনটা কিন্তু ফাটলো না। মাসাহারু দু কানে আঙুল দিয়ে বড়ো বড়ো চোখ করে বললো—'বেলুনটা ফাটছে না তো.....!'

সরঞ্জাম হিসেবে এটার জন্য চাই একটা বড় বেলুন, একটা ভাল লম্বা ধারালো পেরেক অথবা বড় একটা ছুঁচ আর কিছুটা সেলোটেপ। প্রথমে বেলুনটাকে যতদূর সম্ভব ফোলাও তারপর—তার ওপর একটু সেলো-টোপ ভাল করে সেঁটে লাগিয়ে দাও। বেলুনটা টানটান করে ফোলানো থাকলে সেলোটেপ লাগাতে সুবিধা হবে আর সেলোটেপটা একটু চওড়া হলে ভাল হয়। যাই হোক—এই হোল ম্যাজিকের প্রস্তুতি। এবারে পিনটাকে নিয়ে ঐ সেলোটেপের মাঝখানটায় ফুটিয়ে দিলে দেখবে—তোমরাও অবাক হয়ে যাচ্ছো। বেলুনটা ফাটবে না। দর্শকেরা ঐ সেলোটেপের কথা জানতো না—সুতরাং তারা তো খুব অবাক হবেই।

চওড়া সেলোটেপ যদি তোমরা না পাও, তাহলে সরু সেলোটেপও ব্যবহার করতে পারো। তবে সরু সেলোটেপ ব্যবহার করবার সময় বেলুনের ওপর যোগ চিহ্ন বা 'ক্রস'এর মতো করে লাগানো ভাল। 'ক্রসের' ঠিক মধ্যখানে তোমাকে পিন ফোটাতে হবে।

বিমল কর

কাপালিকরা এখনও আছে

উপন্যাস

আগে যা ঘটেছে

গণ্গাচরণ মিত্তির লেনে থাকত তারাপদ। তিন কুলে তার কেউ ছিল না। টিউশানি করে কোনো রকমে কষ্টেসৃষ্টে মেসের খরচ চালাত। একদিন একেবারে আচমকা তারাপদ একটা চিঠি পেল সলিসিটার মৃণাল দত্ত-র কাছ থেকে। মৃণাল দত্ত, তারাপদকে দেখা করতে বলেছেন। চিঠি পড়ে মনে হল, ভুজঙ্গভূষণ হাজরা নামের এক ভদ্রলোকের দেড় দু লাখ টাকার সম্পত্তি তারাপদর ভাগ্যে নচ্ছে। কিন্তু কে এই ভুজঙ্গভূষণ? তারাপদ চেনে না। পদবী থেকে অনুমান হয়, তিনি তারাপদর এক পিসেমশাই হতেও পারেন। তারাপদ তার ডাক্তার বন্ধু চন্দনকে নিয়ে পুরোনো আলিপুরে মৃণাল দত্তর বাড়িতে দেখা করতে গেল সেদিনই সন্ধে বেলায়।

মৃণাল দত্ত খুটিয়ে খুটিয়ে নানাভাবে পরীক্ষা করলেন তারাপদকে। পরীক্ষার সময় তারাপদ অবাক হয়ে দেখল, তাদের পারিবারিক অনেক ছবি ভুজঙ্গভূষণ গোপনে সংগ্রহ করে নিজের কাছে রেখেছিলেন। পরীক্ষায় তারাপদ আসল বলেই প্রমাণিত হল। মৃণাল দত্ত তখন ভুজঙ্গভূষণের ঠিকানা দিলেন, মধুপুরের কাছে শংকরপুরে ভুজঙ্গভূষণ থাকেন। কিছুদিন আগে তাঁর এক দুর্ঘটনা ঘটেছে, তিনি মরণাপন্ন, আগামী সাত আট দিনের মধ্যেই ভদ্রলোক মারা যাবেন। ভুজঙ্গভূষণ জীবিত থাকতে থাকতে যদি অরাপদ শংকরপুরে তাঁর কাছে মৃণাল দত্তর চিঠি নিয়ে পৌঁছতে পারে—তবেই সে ভুজঙ্গভূষণের সম্পত্তি পেতে পারে, নচেৎ নয়।

সেদিন রাত্রেই তারাপদ চন্দনকে সংগে নিয়ে হাওড়া স্টেশন থেকে গাড়িতে উঠল। গাড়িতে আলাপ হল এক মজার মানুষের সংগে, নাম তাঁর কিংকরকিশোর রায়, ছোট করে 'কিকিরা'। কিকিরা নাকি এককালে ম্যাজিসিয়ান ছিলেন। এই ভদ্রলোকই তারাপদদের অবাক করে দিয়ে বললেন, ওরা যেখানে যাচ্ছে সেই জায়গাটার নামের প্রথম অক্ষর 'এস'; যার কাছে যাচ্ছে তাঁর নামের আদ্যক্ষর 'বি'। তারাপদরা কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, কার কাছে যাচ্ছে—এ-কথা কাউকে জানায় নি। কিকিরা কি করে জানলেন তা হলে? এটা ম্যাজিক? না অন্য কিছু?

অনেকক্ষণ আর কেউ কোনো কথা বলল না। তারাপদ ভাল করে আর কিকিরার দিকে তাকাচ্ছিল না, তার সাহস নেই তাকাবার। ভীষণ সন্দেহ হচ্ছে লেকটাকে। মুখে যতই হাসি থাক, মজার মজার কথা বলুক—তবু কিকিরা যে বড় রকমের ঘুঘু তাতে সন্দেহ কি।

আড়চোখে তাকিয়ে তারাপদ চন্দনকে ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝাবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। তার মুখের ভাব, চোখের সাবধানী দৃষ্টি বলছিল : চাঁদু, বি কেয়ারফুল; লোকটা ঘুঘু।

চন্দন নিজেও সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিল। কিকিরা যত বড় ম্যাজিসিয়ানই হোক, ওরা কোথায় যাচ্ছে, কার কাছে যাচ্ছে—এটা মুখ দেখে ঠাওর করতে কিছুতেই পারে না। অসম্ভব। থট্ রীডিং না কি যেন বলে একটা—কিকিরা কি সেই মনের কথা জানতে পারার খেলা দেখাল? বোগাস্। চন্দন ওসব বিশ্বাস করে না। তবে এটা বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছে, কিকিরা প্রচণ্ড ধূর্ত। সে কেমন কায়দা করে পুরো শংকরপুর, কিংবা সোজাসুজি ভুজঙ্গভূষণ না বলে রহস্যময় ভাবে বলল, প্রথম অক্ষরটা এস আর বি। ও যে সবই জানে তাতে চন্দনের সন্দেহ হচ্ছিল না। অন্তত, কিকিরা নিশ্চয় জানে চন্দনরা শংকরপুরে যাচ্ছে, ভুজঙ্গভূষণের কাছে।

চন্দন চোখে চোখে তারাপদকে বোঝাবার চেষ্টা করল : সবই বুঝতে পারছি। সাবধান হতে হবে।

কিকিরা কিন্তু একই রকম হাসিমুখে তারাপদদের দেখছিলেন। বরং তাঁর চোখ দেখে মনে হচ্ছিল, কিকিরা এ-রকম একটা খেলা দেখাবার পর যেন তারাপদদের হাততালি আশা করেছিলেন, না পেয়ে একটু দুঃখবোধ করছেন।

চন্দন মনে মনে ভেবে দেখল, আর বেশীক্ষণ চুপচাপ থাকা উচিত নয়। ওরা ভয় পেয়েছে কিকিরা সেটা বুঝে ফেলবে। বার দুই শুকনো কাশি কেশে তারাপদকে বলল, "অনেক রাত হয়ে গেল; তুই শুয়ে পড়। আমি জেগে আছি। ট্রেনে আমার ঘুম হয় না।"

তারাপদ ঘুমোবে কি, ঘুম তার মাথায় উঠে গেছে।

কিকিরাই যেন কি মনে করে বললেন, "বাস্তবিক স্যার, রাত হয়ে গেছে অনেক, বারোটায় বর্ধমান পেরিয়ে এসেছি। তা ধরুন এখন সাড়ে বারো। শীতটাও জম্বর। এবার শোবার ব্যবস্থা করতে হয়। তবে একজনের জেগে থাকা উচিত নয়ত এ-গাড়িতে যা চোরের উৎপাত গা থেকে জামাকাপড়ও খুলে নিয়ে যায়।"

চন্দন একটু ঠাট্টার ছলেই বলল, "আপনার নিশ্চয় অম্বলের রোগ আছে, বয়েসও হয়েছে, আপনি শুয়ে পড়ুন—আমি জেগে আছি।"

কিকিরা বললেন, "ঠিক ধরেছেন স্যার, আমার জুস বেশী হয়, রাত জাগলে বোতলের সোডার মতন হয়ে যায় পেট বুক। সে কী কষ্ট। যাক্‌গে, আমি একবার বাথরুম ঘুরে এসে শুয়ে পড়ি, কি বলেন?"

বালাপোষটা হাত দিয়ে আবার একটু ঝেড়েঝুড়ে কিকিরা উঠে দাঁড়ালেন, বাথরুম যাবেন।

তারাপদ যেন এই সুযোগের অপেক্ষা করছিল।

কিকিরা ওপাশে বাথরুমের দিকে যেতেই নীচু গলায় তারাপদ বলল, "চাঁদু লোকটা ঘোড়েল। ওর কোনো মতলব আছে।"

চন্দন বলল, "আমিও তাই ভাবছি। ম্যাজিকফ্যাজিক বাজে কথা।"

"কিকিরা কি আমাদের ফলো করছে?" তারাপদ জিজ্ঞেস করল।

"তাই তো মনে হয়। কিন্তু কেন?"

তারাপদ দূরে বাথরুমের দিকে তাকাল। কিকিরা দরজা খুলে ঢুকে গেলেন।

তারাপদ বলল, "আমার কাছে ভুজঙ্গভূষণের নামে একটা সিল করা প্যাকেট, চিঠিফিঠি আছে, মৃণাল দত্ত দিয়েছেন। ওগুলো যতক্ষণ না ভুজঙ্গভূষণের হাতে দিতে পারছি ততক্ষণ আমার কোনো ক্লেম হচ্ছে না সম্পত্তির ওপর।"

"তা জানি," চন্দন মাথা নাড়ল। "কিকিরা কি ওটা হাতাবার জন্যে এসেছে? তাতে ওর লাভ কি হবে? কিকিরা তো তারাপদ নয়, যে ওগুলো হাতিয়ে ভুজঙ্গভূষণের কাছে হাজির হলেই দেড় দু লাখ টাকার সম্পত্তি পেয়ে যাবে। তাছাড়া ওর মধ্যে কি আছে তাও তো আমরা জানি না।"

তারাপদ চিন্তায় পড়ে কেমন বিমর্ষ হয়ে আসছিল। বলল, "আমিও তো তাই ভাবছি। ...আচ্ছা, তোর কি মনে হয়, কিকিরা মৃণাল দত্তর লোক?"

"মানে?"

"মৃণাল দত্ত ওকে পাঠান নি তো? উনি ছাড়া আর তো কেউ জানে না আমরা শংকরপুরে ভুজঙ্গভূষণের কাছে যাচ্ছি।"

চন্দন বন্ধুর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল। ভাবল। বলল, "তা ঠিক। তুই যখন সকালে মৃণাল দত্তর বাড়ি গিয়েছিলি তখন কাউকে দেখেছিস?"

"না", মাথা নাড়ল তারাপদ।

"ঘরে কেউ ছিল না?"

"কালকের সেই বুড়ো মতন লোকটি দু একবার এসেছিল।"

"তার চোখের সামনেই মৃণাল দত্ত তোকে ওই সব দিয়েছেন?"

"হ্যাঁ।"

"গাড়ির কথা কিছু বলেছেন?"

"বলেছেন, রাত্রে দুটো গাড়ি আছে, একস্প্রেস শংকরপুরে থামে না।"

চন্দন কিছুই বুঝতে পারল না। মৃণাল দত্ত নিজেই তাঁর মক্কেলের জন্যে তারাপদর খোঁজ করছিলেন, তিনি যেচে তারাপদকে ভুজঙ্গভূষণের কাছে পাঠাচ্ছেন, এটা তাঁর কর্তব্য। তবে কেন তিনি পেছনে লোক লাগাবেন? তাহলে কি ওই বুড়ো লোকটা, মৃণাল দত্তর বাড়ির কাজের লোকটা, আসলে অন্য কারও হাতের পুতুল। তাই যদি হয়, তবে ধরে নিতে হবে, ভুজঙ্গভূষণের সম্পত্তি যাতে তারাপদর হাতে না যায় সেজন্যে ফন্দি আঁটার লোক আছে। তারাই কিকিরাকে লাগিয়েছে। কিন্তু এসব ভাবনা কি বাড়াবাড়ি নয়। কার গরজ তারাপদকে বঞ্চিত করার। তেমন কাউকে তো দেখা যাচ্ছে না।

চন্দন বলল, "আমি ভাই কিছু বুঝতে পারছি না। এভরিথিং ইজ মিস্টিরিয়াস। ভুজঙ্গভূষণ, মৃণাল দত্ত, কালো বেড়াল, কিকিরা—সবই কেমন গোলমেলে।"

তারাপদ ম্লান মুখ করে বলল, "আমারও মাথায় কিছু ঢুকছে না। লাভের মধ্যে ভাবতে ভাবতে মাথা ধরে গেল। টাকা-পয়সা, সম্পত্তির ব্যাপারটাই ঝঞ্ঝাটের। বেশ ছিলুম, এখন কি প্যাঁচেই পড়লাম।"

কিকিরাকে আবার দেখা গেল।

চন্দন নীচু গলায় বলল, "যাই হোক—তুই ঘাবড়াবি না, তারা। ওই লোকটার কাছে একেবারেই নার্ভাসনেস দেখাবি না। ওর সামনে তুইও শুয়ে পড়।"

"আমার ঘুম হবে না।"

"না হোক, তবু তুই শুয়ে পড়বি। ঘুমোবার ভান করবি। আমি জেগে থাকব। হাসপাতালের ডিউটিতে আমার রাত জাগা অভ্যেস আছে।"

"তুই একলা কতক্ষণ জাগবি?"

"সারা রাত। কিকিরাকে আমি নজর রাখব।"

তারাপদর হঠাৎ মনে পড়ল, কিকিরা বলেছে, তার সুটকেসে নাকি খুরটুর আছে। স্যাম্পল দেখাবে বলেছিল। লোকটা কত বড় শয়তান। সুটকেসে করে খুর এনেছে। গলা কাটবে নাকি? খুন?

তারাপদ ভয়ে ভয়ে বেঞ্চির তলার দিকে তাকাল, কিকিরার সুটকেস দেখবার চেষ্টা করল। তারপর অস্ফুটভাবে চন্দনকে বলল, "কিকিরার কাছে খুর আছে—।"

কিকিরা তৎক্ষণে একেবারে কাছে এসে পড়েছেন।

চন্দন আবার একটা সিগারেট ধরাল। যেন কিছুই হয়নি।

তারাপদ তখনও বসে।

কিকিরা বললেন, "জমজম করে শীত পড়ছে। পানাগড় দুর্গাপুর কাছেই বোধ হয়। আরও জব্বর ঠান্ডা পড়বে স্যার, একেবারে আর্লি মর্নিংয়ে আসানসোল, তারপর শীতের বহরটা দেখবেন, লাইক্ ক্যাটস্ অ্যান্ড্ ডগস্।"

চন্দন ব্যঙ্গ করে বলল, "ওটা বৃষ্টির বেলায় স্যার, শীতের বেলায় নয়।"

কিকিরা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ খক্‌খকে হাসি হেসে বললেন, "একই হল স্যার, বৃষ্টির বেলায় যদি বেড়াল কুকুর পড়তে পারে শীতের বেলায় কেন পড়বে না। ইংরিজী ভাষার কোনো নিয়ম নেই, যা পড়াবেন তাই পড়বে।"

কথা বলতে বলতে কিকিরা তাঁর সেই বেখাপ্পা অলেস্টার খুলে পাট করে বালিশের মতন করে নিলেন। টুপি আগেই খুলেছিলেন, মাফলারটা পাগড়ির মতন করে কানে বাঁধলেন, জুতো খুললেন।

চন্দন ইশারায় তারাপদকেও শুয়ে পড়তে বলল।

কিকিরা পাট করা অলেস্টারের ওপর মাথা রেখে বালাপোষ গায়ে টেনে শুয়ে পড়তে পড়তে বললেন, "স্যার, একটু সাবধানে থাকবেন। চোখের পাতাটি বুজেছেন কি সর্বনাশ হয়ে যাবে। ...আচ্ছা, শুয়ে পড়ি। আসানসোলে আমায় ডেকে দেবেন। চা খাব।"

কিকিরা লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে চোখ বুজলেন। তারাপদও যেন বাধ্য হয়ে শুয়ে পড়ল।

কামরার মধ্যেটা একেবারেই চুপচাপ। কেউ কেউ বেঞ্চের ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে, কেউ কেউ বাংকের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে, পুঁটলি পাকানো চেহারা করে বসে বসেই ঘুমোচ্ছে দু চার জন। মাঝে মাঝে

কাশির শব্দ, এক আধটা ঘুম-জড়ানো কথা, ট্রেনের একঘেয়ে শব্দ—সব মিলিয়ে কেমন একটা নিঝুম আবহাওয়া।

একটা ছোট স্টেশনে গাড়ি থেমে আবার চলতে শুরু করল। চন্দন বড় বড় হাই তুলছিল।

কিকিরা ঘুমিয়ে পড়েছেন। তারাপদ অনেকক্ষণ মটকা মেরে পড়েছিল। সারাদিনের ক্লান্তি যেন কখন তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিল।

চন্দন নানারকম কথা ভাবছিল। কিকিরা লোকটা কি সত্যিই চালাক? তার ভাঁড়ামির খানিকটা হয়ত অভিনয়, কিন্তু চালাকির ব্যাপারটা অভিনয় করে দেখানো যায় না। কিকিরা যদি চালাকই হবে তাহলে সে কেন অযথা প্রথমেই চন্দনদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করতে গেল? যে-লোক জানে চন্দনরা শংকরপুরে ভূজঙ্গভূষণের কাছে যাচ্ছে—সেই লোক কেন আগেভাগে তা প্রকাশ করে দেবে? বরং সে চুপচাপ থাকবে, ঘুণাক্ষরেও জানতে দেবে না তারাপদদের ব্যাপারটা সে ছিটেফোঁটাও জানে। তারপর সবাই যখন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়বে, কিকিরা তারাপদর কিট্ ব্যাগ নিয়ে নেমে পড়বে যে কোনো স্টেশনে। এই গাড়িটা এমনই যে, যখন তখন নেমে পড়া যায়, অনবরত থামছে, চলছে, আবার থামছে।

কিকিরা বোকামি করেছে। হয় বোকামি করেছে, না হয় জেনেশুনে ইচ্ছে করেই সতর্ক করে দিয়েছে। জানিয়ে দিয়েছে, তারাপদদের ব্যাপার সে জানে। কিন্তু কেন কিকিরা সতর্ক করে দেবে? চোর কি বাড়ির লোককে সাবধান করে দিয়ে চুরি করে? তবে?

চন্দন যতই ভাবছিল ততই তার মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। শুরু থেকেই যার মধ্যে এত রহস্য আর ঝামেলা—শেষে গিয়ে তার মধ্যে যে আরও কত গভীর রহস্য দেখা যাবে কে জানে।

গায়ে হাত পড়তেই চন্দন ধড়মড় করে উঠে বসল। মুখের সামনে কিকিরা। চন্দন তারাপদকে দেখে নিল। ঘুমোচ্ছে তারাপদ।

"আপনি স্যার ঘুমিয়ে পড়েছিলেন," কিকিরা বললেন, এমনভাবে বললেন যেন কতই না সহানুভূতি দেখাচ্ছেন।

চন্দন বলল, "হ্যাঁ, কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।" ঘুমিয়ে পড়ার জন্যে তার লজ্জা এবং রাগ হচ্ছিল।

"অনেকক্ষণ থেকেই ঘুমোচ্ছেন," কিকিরা হাসি হাসি মুখ করলেন।

চন্দন তাড়াতাড়ি হাতের ঘড়ি দেখল। সর্বনাশ, সাড়ে তিনটে বাজে। সে যখন শেষবার ঘড়ি দেখে তখন দুটো বাজছিল। টানা দেড় ঘণ্টা সে ঘুমিয়ে থাকল। আশ্চর্য। হাসপাতালে কখনও এ-রকম হয় না। রাত্রের গাড়িটাড়ির এই দোষ, যাত্রীদের ঘুম, ঢুলুনি, গাড়ির দোলানি, একঘেয়ে শব্দ, ট্রেন থামা আর যাওয়া, হলদু হলদু আলো সব মিলেমিশে কেমন ঘুম এনে দেয়। ছোঁয়াচে রোগের মতন ব্যাপারটা।

চন্দন কিকিরাকে সন্দেহের চোখে দেখল। "আপনি কি জেগেছিলেন?"

"আমার ঘুম স্যার খুব পাতলা, একটু খুসখাস শব্দ হলেই জেগে উঠি। রাতের গাড়িতে চলাফেরা করতে করতে এই অভ্যেস হয়ে গেছে—।"

চন্দন হাই তুলল। চোখ যেন এখনও জুড়ে রয়েছে।

"আপনি অনেকক্ষণ থেকে জেগে বসে আছেন?" চন্দন জিজ্ঞেস করল।

"অনেকক্ষণ। বসে নয়, শুয়ে ছিলাম।"

হঠাৎ চন্দনের কেমন যেন মনে হল, মনে হতেই চমকে উঠল। আরে—কিকিরা এর মধ্যে কোন হাত সাফাই করেনি তো? তারাপদর কিট্ ব্যাগে মৃণাল দত্তর দেওয়া সেই কাগজপত্তর ঠিকঠাক আছে? না কিকিরা চুরি করে নিয়েছে?

কথাটা মনে হতেই চন্দনের বুক ধকধক করে উঠল, ভয় যেন লাফ মেরে গলার কাছে এসে বসল। তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ে সে তারাপদকে ঠেলা দিল। "তারা, এই তারা—!"

বলিহারী ঘুম তারাপদর। মরার মতন ঘুমোচ্ছে।

"ওঁকে আবার কেন অযথা জাগাচ্ছেন, স্যার?" কিকিরা বলল।

"দরকার আছে," চন্দন রুক্ষভাবে জবাব দিল।

বার কয়েক ঠেলা খেয়ে তারাপদ উঠে বসল। উঠে বসে চোখ রগড়াতে লাগল। যেন তার খেয়ালই নেই সে বাড়িতে বিছানায়, না রেলগাড়িতে। কয়েক মুহূর্ত পরে তারাপদ হুঁশ ফিরে পেল।

চন্দন রেগে গিয়ে বলল, "আশ্চর্য ঘুম তোর!"

তারাপদ লজ্জিত হয়ে বলল, "কাল সারাদিন যা ধকল গিয়েছে—পারছিলাম না।"

"এদিকে যে—" বলতে গিয়ে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিল চন্দন, আড়চোখে কিকিরাকে দেখে নিল। তারপর ইঙ্গিতে বলল, "আমিও ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।" বলে কিকিরাকে দেখাল, "উনি জেগে ছিলেন।"

তারাপদ হয় ইঙ্গিতটা বুঝল না, না হয় তার মাথা মোটা। সে তখনও হাই তুলছে।

বিরক্ত হয়ে চন্দন আবার বলল, "এই ট্রেনে ছিঁচকে চোরের যা উপদ্রব। দেখে নে আমাদের জিনিসপত্র ঠিক আছে কিনা?"

তারাপদ এবার বুঝতে পারল। তার মুখের অদ্ভুত এক চেহারা হল।

কিকিরা বললেন, "না না, এদিকে কেউ আসেনি। আমার ঘুম ভেরী ভেরী থিন, গায়ের পাশ দিয়ে কেউ হেঁটে গেলেই ঘুম ভেঙে যায়।"

চন্দন তারাপদকে হুকুমের ভঙ্গিতে বলল, "তা হলেও একবার দেখে নে।"

তারাপদ কিট্ ব্যাগ টিট্ ব্যাগ দেখল।

"তোর ব্যাগের মধ্যে আমার একটা সিগারেটের প্যাকেট রেখেছিলাম—দেখ তো আছে কি না?" একেবারে ডাহা মিথ্যে কথা চন্দনের। সে চাইছিল, ব্যাগ খুলে তারাপদ একবার আসল জিনিসটা আছে কিনা দেখে নিক।

তারাপদ কোলের ওপর ব্যাগ তুলে চেন খুলল। দেখল। হাত ডুবিয়ে ডুবিয়ে ঘাঁটল। তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। মৃণাল দত্তর দেওয়া জিনিসগুলো ঠিকই রয়েছে।

তারাপদ কায়দা করে বলল, "আছে।...তুই এখন আমার সিগারেট নে। নতুন প্যাকেট পরে ভাঙবি।"

চন্দন নিশ্চিন্ত হল। বাব্বা, যা ভয় ধরে গিয়েছিল তার।

কিকিরা সমস্ত ব্যাপারটাই স্বাভাবিকভাবে দেখছিলেন। এবার বললেন, "আমায় একটা সিগারেট খাওয়ান, স্যার; যা শীত...।"

চন্দন তারাপদর প্যাকেট থেকে কিকিরাকে সিগারেট দিল। নিজেও ধরাল।

বালাপোষ গায়ে জড়িয়ে বসে সিগারেট খেতে খেতে কিকিরা খক্ খক্ করে কাশছিলেন। বললেন, "সিগারেটের নেশা আমার নেই, একটা দুটো খাই কখনো।"

গাড়িটা যেন কোনো ইয়ার্ডে ঢুকল। লাইন বদলের শব্দ হচ্ছে। এক একবার বাঁয়ে টাল খাচ্ছে, আবার যেন ডাইনে টাল খেল।

কিকিরা বললেন, "অণ্ডাল এসে গেল। আর খানিকটা পরে আসানসোল। সোয়া চারটে নাগাদ আসানসোল পৌঁছোয়।"

"আপনি এদিকে খুব যাতায়াত করেন?" চন্দন জিজ্ঞেস করল।

"প্রায়ই।"

"সবই আপনার চেনা।"

"তা বলতে পারেন।"

তারাপদ হঠাৎ বলল, "যশিডিতে থাকবেন এখন?"

"যশিডিতে নয়, দেওঘরে যাচ্ছি...। ওখানে আমার ফিল্ড আছে।"

"কি?"

"ফিল্ড স্যার, মানে চেনাজানা আছে, কাস্টমার রয়েছে।"

চন্দন মনে মনে একটা প্যাঁচ ভাবছিল। দাবা খেলার চালের মতন একটা মোক্ষম চাল দিলে কেমন হয়? কিকিরা কি সামলাতে পারবে? হয়ত কিকিরা আরও পাকা খেলোয়াড়, চন্দনকে বসিয়ে দেবে। তবু একটা ঝুঁকি নিতে আপত্তি কি? এখনও যাত্রা শেষ হয়নি চন্দনদের, আরও পাঁচ ছ ঘণ্টার বেশী ট্রেনে থাকতে হবে। কিকিরার যদি কোনো মতলব থাকে, এর মধ্যে হাসিল করবে কি না কেউ বলতে পারে না। তবে এখন পর্যন্ত করেনি। সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দিয়েছে। যদি তারাপদর ব্যাগ নিয়ে কিকিরা কোথাও নেমে যেত মাঝপথে চন্দনরা জানতেও পারত না। লোকটাকে পুরোপুরি অবিশ্বাস করার চেয়ে একটু বিশ্বাস করা যাক্ না, ক্ষতি কি!

চন্দন আরও খানিকক্ষণ ভেবে শেষে বলল, "স্যার, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"

"নিশ্চয় নিশ্চয়, একশোটা কথা জিজ্ঞেস করুন।"

"আপনি যে বললেন, আমরা মধুপুর যাচ্ছি—এটা কি করে বললেন?"

কিকিরা অদ্ভুত মুখ করে হাসলেন, "ম্যাজিক।"

"ম্যাজিক দেখতে আমাদের ভাল লাগে, কিন্তু তা বিশ্বাস করি না।"

"ভাল ম্যাজিক আপনারা দেখেননি স্যার,, তাই বলছেন,—" কিকিরা বললেন। একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, "আপনারা ছেলেমানুষ, অনেক কিছুই জানেন না, দেখেননি। যখন দেখবেন, জানবেন—তখন বিশ্বাস করবেন।"

"তা বলে এই থট্ রিডিং না কি যেন বলে তাও বিশ্বাস করতে হবে? আপনি নিজেই তখন বলছিলেন, ম্যাজিক হল খেলা, মন্ত্রতন্ত্র বাজে—।"

"বলেছি," কিকিরা ঘাড় হেলালেন, "এখনও বলছি, মন্ত্রতন্ত্র বাজে। তবে যোগীদের আমি বিশ্বাস করি। তাঁরা আশ্চর্য আশ্চর্য ঘটনা ঘটাতে পারেন। মাটি চাপা হয়ে তিন ঘণ্টা কি করে মানুষ থাকতে পারে স্যার, আপনি তো ডাক্তার, বলুন না?"

চন্দন কোনো জবাব দিল না। কিকিরাকে এখন আর ভাঁড় মনে হচ্ছে না। তার গলার স্বরও যেন পালটে গিয়েছে।

তারাপদ বলল, "আপনি কি যোগী?"

"না না," কিকিরা মাথা নেড়ে জিব কাটল, "যোগের ষ পর্যন্ত আমি জানি না। ওসব মহাপুরুষরা পারেন, আমরা কত তুচ্ছ।"

"তাহলে আপনি কি করে জানলেন আমরা কোথায় যাচ্ছি, কার কাছে যাচ্ছি?"

কিকিরা খুব বিনয় করেই যেন বললেন, "এ-কথাটা ঠিক হল না স্যার, আমি শুধু বলেছি আপনারা যেখানে যাচ্ছেন সেই জায়গাটার নামের প্রথমে 'এস' অক্ষর আছে। যার কাছে যাচ্ছেন তাঁর নামের প্রথমে 'বি' অক্ষর আছে। তা আপনারা তো এস অক্ষর দিয়ে নামের কত জায়গাতেই যেতে পারেন, সীতারামপুর, সালানপুর, শিমুলতলা আর যার কাছে যাচ্ছেন তাঁর নাম বিহারীপ্রসাদ, বিজনকুমার, বটুকচন্দ্রও হতে পারে..."

চন্দন বুঝতে পারল, কিকিরা পাকা লোক, সহজে মচকাবে না। বলল, "হতে সবই পারে, কিন্তু আপনি জানেন আমরা কোথায় যাচ্ছি। জানেন না?"

কিকিরা হাসিহাসি মুখ করে চেয়ে থাকলেন।

চন্দন আর তারপদ তাকিয়ে থাকল, অপেক্ষা করতে লাগল।

কিকিরা কোনো কথাই বলছিলেন না।

"কিছু বলছেন না?"

"কি বলব স্যার!"

"আপনি সত্যি সত্যিই কিছু জানেন না?"

কিকিরা এবার একবার তারাপদর দিকে তাকালেন। চোখ বন্ধ করলেন। আবার খুললেন। তাঁর হাসি হাসি মুখ ধীরে ধীরে গম্ভীর, করুণ হয়ে উঠল, গলার স্বর ভারী শোনাল। বললেন, "একটা কথা আপনাদের আমি বলে দিই। আপনারা ছেলেমানুষ। যেখানে যাচ্ছেন সেই জায়গা কিন্তু ভয়ংকর। আপনারা ভয় পেয়ে যাবেন, বিপদেও পড়তে পারেন। চোখ কান খোলা রাখবেন। কোনো ভেলকি বিশ্বাস করবেন না। ওই লোকটা যোগী নয়, শয়তান, পিশাচ। তার চেহারা দেখলে আপনাদের বুক কাঁপবে। অনেক মানুষের জীবন সে নষ্ট করেছে। ও একটা কাপালিক। কী নিষ্ঠুর জানেন না। এত বড় শয়তান কেমন করে বেঁচে আছে—আমি জানি না। ভগবান এত লোককে নেন, ওই পিশাচকে কেন নেন না?" বলতে বলতে কিকিরার মুখ কেমন রক্তজমার মতন নীলচে হয়ে এল। তিনি দু হাতে মুখ ঢেকে ফেললেন।

তারাপদ আর চন্দন যেন স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকল। কোনো কথা বলতে পারল না।

কোনোরকমে কাঁপা কাঁপা গলায়, জড়ানো স্বরে তারাপদ বলল, "সামনের অমাবস্যায় নাকি তিনি মারা যাবেন?"

কিকিরা বললেন, "তাই যেন যায়।...এত পাপ করেও মানুষ যদি বেঁচে থাকে তবে ভগবান বলে কিছু নেই।"

চন্দনরা অবাক হয়ে দেখল, কিকিরার গলা ফুলে উঠেছে, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

(ক্রমশ)

ছবি এঁকেছেন ॥ শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

কৈলাসে চা পান

আশাপূর্ণা দেবী

মা দুর্গা কৈলাসে ভাঁড়ার ঘরের সামনে বসে পান সাজছিলেন। জয়া-বিজয়া কাছে বসে খয়ের সুপুরি কুচিয়ে দিচ্ছিল; তা দিক, পান সাজাটি মা কারো হাতে দিতে রাজী নন, ভোলা মহেশ্বরের জিনিস বলে কথা! কে চুণ বেশী দিয়ে ফেলবে, কে খয়ের বেশী দিয়ে ফেলবে, বেচারী ভোলানাথের গাল পুড়বে, জিভ তিতোবে।

শত কাজের মধ্যে তাই মা দুর্গার নতুন এই এক কাজ বেড়েছে। গত বছর মর্তলোক থেকে এই পানের নেশাটি ধরিয়ে এসেছেন ভোলা মহেশ্বর।

অবিশ্যি চিরটাকালই তো তিনি বছরে বছরে ওই মর্তভূমিতে শ্বশুর-বাড়ির দেশে যাচ্ছেন আসছেন। তিনদিন ধরে খানাপিনা, বাজনা বাদ্যি, আলো রোশনাই, আর জগঝম্পর ঝালাপালা হয়ে, দশমীতে কৈলাসে এসে বাঁচছেন, আর এসে মা দুর্গার কাছে তার বাপের বাড়ির দেশের লোকদের বাড়াবাড়ির নিন্দে মন্দ করছেন, শিখে টিখে তো কিছু আসছেন না কখনো। হঠাৎ গত বছরেই কি হল?

তাহলে খুলেই বলতে হয় ব্যাপারটা। চিরকালই পুজোয় কাঁচা চালের নৈবিদ্যির চুড়োর ওপর ফাঁকা পানের খিলি বসানো থাকে, পুরুত ঠাকুর তাই 'নমঃ নমঃ' করে নিবেদন করে সারেন, কিন্তু গতবারে 'খেজুর বাগান সাইকেল ক্লাবের সার্বজনীন পুজোয় চোঙাপ্যাণ্ট আর নামাবলী শার্ট পরা ভক্তরা হঠাৎ এ দৃশ্য দেখে বলে উঠেছিল, 'এ কী ঠাকুর মশাই, পানের খিলি ফাঁকা কেন? ঠাকুর দেবতার সঙ্গে ফাঁকির কারবার? মশলা কই?'

পুরুত বললেন, 'পুজো করে চুল পাকালাম বাবা, নৈবিদ্যির পানে তো কখনো মশলা থাকতে দেখিনি, ফাঁকাই থাকে।'

'চোঙা প্যান্টরা বলল, 'না, না, ছি ছি; ওটা ঠিক নয় স্যার, এনে দিচ্ছি মশলা।'

সামনের পানের দোকান থেকে মশলা টশলা তো এনে দিলই, তার সঙ্গে আবার দিলীপের জর্দাও। বেশ তোয়াজি পান হল। কিন্তু মা দুর্গার তো ওসবে অভ্যেস নেই। একটা খেয়েই মাথা বন্‌বন্‌। তাড়াতাড়ি বাকি পান-গুলো মহাদেবকে দিয়ে বললেন, 'আপনি খান ঠাকুর, আপনার ভাঙ খাওয়া মাথা, দেখুন যদি না ঘোরে।'

খেলেন ঠাকুর, আর সেই ঘুরলই মাথা।

মানে খেয়ে মাথাটি যাকে বলে একেবারে 'ঘুরে গেল,' ভাবলেন, আহা হা, এ কী জিনিস! এমন মধুর জিনিস থেকে এতদিন বঞ্চিত ছিলাম! সিদ্ধি খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেছে। মিঠে পানের সঙ্গে দিলীপের জর্দা! আহা! অতুলনীয়।'

চুপি চুপি বললেন, 'দুর্গা এই পান বানানোর ফরমুলাটা শিখে যেতে পার?'

মা দুর্গা বললেন, 'ফরমুলা শিখে কী হবে? কৈলাসে পানপাতা পাওয়া যাবে?'

'পুঁতলে হয়না?'

দুর্গা হাসলেন, 'এ কী লেবুগাছ, পেয়ারা গাছ যে, পুঁতলেই হল? ওর চাষ আছে, তার নানান ঝঞ্ঝাট আছে, তবে বলেন যদি তো বস্তাকয়েক নিয়ে যেতে পারি নন্দী ভৃঙ্গীর মাথায় চাপিয়ে।'

শিব বললেন, 'ওরা দুজনে আর কত পারবে? তোমার জয়া বিজয়াকেও লাগিয়ে দাও।'

দুর্গা মাথা নেড়ে বললেন, 'না ওদের হাতে অন্য জিনিস থাকবে। নন্দী ভৃঙ্গী গন্ধমাদন বইতে পারে।'

ব্যাপার এই, মা দুর্গাও বছর দুই হল মর্তলোক থেকে একটি বদভ্যাস করে বসে আছেন, সেটি প্রকাশ করেন নি। রান্নাঘরের কোণে বসে সেরে নেন. জয়া বিজয়া পেসাদ পায়।

তা তারও একটা ইতিহাস আছে।

বসন্তপুরের বিখ্যাত মুখুয্যে বাড়িতে হচ্ছিল মায়ের পুজো, খুব রমরমা। কিন্তু মুখুয্যে কর্তার সেবছর শরীর খারাপ. ডাক্তার বলেছে উপোস চলবে না, অন্তত একটু চাও খাবেন।'

বরাবর কর্তা মহাষ্টমীতে উপোস করে আসছেন, এবার খেতে হবে, মন খারাপ। ছেলের বৌ একটা বড় পাথরের গেলাসে করে চা দিয়ে গেছে, বিশুদ্ধ চা খেলে যদি উপোসের দোষ কিছুটা কাটে। মুখুয্যে কর্তা সেটি নাড়াচাড়া করছেন, মুখে তুলতে হাত উঠছে না. ছেলে বকাবকি করে গেল. কী বাবা এখনো খাননি?'

মুখুয্যে কর্তা তখন দেবীর সামনে গেলাশটা বসিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, 'তবে মা তুই আগে পেসাদ করে দে।'

অগত্যাই মাকে অলক্ষ্যে সেই চায়ে চুমুক দিতে হল, ব্যস তারপরেই অস্থির! ঘোরতর চিন্তা, জয়া, খোঁজ নে এ জিনিস কোথায় পাওয়া যায়. কী করে বানাতে হয়।'

অতঃপর চুপি চুপি মর্ত থেকে টিন কয়েক কৈলাসে নিয়ে এলেন! এবছরেও এনেছেন।

তা' রেখে রেখে না খেলে, ও আর ক'দিন? নন্দীভৃঙ্গীর চোখে পড়ে গেলে তো মিনিটে মিনিটে উনুনে কেটলী চাপাবে।

এই যে বস্তা বস্তা পান এল, তাও তো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তবু তো জয়া হিমালয়ের এক গভীর গহ্বরে, মানে প্রায় 'ডীপ্ ফ্রীজে' তুলে রেখে দিয়েছে পলিথিনের ঠোঙায় মুড়ে, তাই না পচে টচে যায়নি!

কিন্তু আর ক'দিন চলবে?

যতই মা দুর্গা গুনে গুনে খরচ করুন, সামনের পুজো পর্যন্ত কি আর পৌঁছবে? শিবঠাকুরের তাই মন খারাপ। ভাবছেন, বলবেন, 'দুর্গা, কাল থেকে, দুটোর বেশী পান খাব না'.

এমন সময় হঠাৎ শিবের আসন টলে উঠল। চমকে বলে উঠলেন, 'নন্দী, দেখ তো কে কোথায় ডাকছে।'

নন্দী কৈলাসের উঁচু চূড়ো থেকে দেখে বলল, 'একটা লোক আপনার এক মন্দিরে হত্যে দিচ্ছে।'

'সেরেছে! আবার কার কী হল রে বাবা! ...নন্দী, কোন মন্দিরে?'

নন্দী আরো বুক ঝুঁকিয়ে দেখল।

'আজ্ঞে জৈ গ্রামে জল্পেশ্বরের মন্দিরে'

'কী চায় লোকটা?'

'প্রভু কী আর বলব? মামলায় জিততে চায়।'

শিবঠাকুর নিশ্বাস ফেলে বলেন, 'আচ্ছা নন্দী, এদের নিয়ে কী হবে? মামলা জিততে চায় তাও আমার মন্দিরে হত্যে?'

'তা, কি আর করবে? আপনি ছাড়া গতি কোথায়? জিততে তো হবে?'

'বলি লোকটা ভাল না মন্দ?'

নন্দী মাথা চুলকে বলে, 'প্রভু আপনি তো সর্বজ্ঞ।'

'হুঁ, তার মানে তুমি একটু এন-কোয়ারি করে দেখতেও পারবে না। তা' করে কি লোকটা তা' জানো?'

'জানলাম আজ্ঞে, মানে অবলোকন করে দেখছি, লোকটা পানের কারবারি।'

'অ্যাঁ!'

মহাদেব চাঙ্গা হয়ে বসলেন, 'কিসের কারবারি?'

নন্দী উদাস গলায় বলল, 'আজ্ঞে পানের। পানের ব্যবসা করে, নিজের পানের বরজও আছে—'

শিবঠাকুর ভাঙের নেশা ছেড়ে সোজা হয়ে বললেন, 'বল কী নন্দী? আর এই লোক অসুবিধের পড়েছে? হত্যে দিচ্ছে? যাও চটপট চলে যাও, স্বপ্নাদেশ দাও গে 'ভয় নেই'। আর এই নিয়ে যাও আমার একটু বিভূতি। এর মধ্যেই আমার একটু শক্তি মিশিয়ে দিলাম, দেখবে এই লোক যেন কিছুতেই না হারে। নামটা কী ওর?

নন্দী আবার পৃথিবীতে উঁকি দিয়ে বলল, আজ্ঞে নাম বিরিঞ্চি ঘোড়েল।'

'বেশ, বেশ। মামলাটা কিসের?'

'ওই যা হয় প্রভু! জমিজায়গা বিষয় সম্পত্তি নিয়ে জ্ঞাতির সঙ্গে।'

'ঠিক আছে। ওই জ্ঞাতিটাকে গোহারান হারিয়ে দিবি। চটপট চলে যা।'

মর্তে যাবার নামে তো নন্দী এক-পায়ে খাড়া। আহা ওখানে কত মজা, কত আমোদ! পোড়া কৈলাসে সিনেমা আছে? সার্কাস আছে? মেলা আছে? রাতদিন বাজী বাজনা, সভা ফাংশান আছে?...হুঃ। তাড়াতাড়ি সেজে গুজে মা দুর্গাকে প্রণাম করতে যাচ্ছে, ভৃঙ্গী ধরল, 'বেশ মজায় আছিস দাদা! ক'দিন থাকবি?'

'কি জানি, ক'দিনে কাজ মেটে!'

'এত্তার সিনেমা দেখবি তো?'

নন্দী একটু হেসে ভৃঙ্গীর পিঠ চাপড়ে বলে যায়, 'মন খারাপ করিসনা, পরের চান্সে তুই যাস।'

ভৃঙ্গী বেজার গলায় বলে, 'যাবনা কেন? মর্তে যখন মড়ক মহামারি হয়ে, বাবার আসন টলবে, তখন বাবা আমায় পাঠাবেন।'

গোঁজ হয়ে বসে থাকে।

নন্দী মা দুর্গার অন্দরের দিকে এগোয়।

কিন্তু ওখানেও এক কাণ্ড!

ওখানেও পৃথিবীর এক ভক্ত আকুলি বিকুলি প্রার্থনায় মা দুর্গার আসন টলিয়েছে।

বিজয়া এনকোয়ারি করে জেনেছে জৈগ্রামের পশু ঘোড়েল নামের এক লোক মা দশভুজার মন্দিরে মাথা খুঁড়ছে, আর মোটা মোটা মানত করছে মামলা জিতিয়ে দিতে হবে।

মা দুর্গা প্রথমে ভারী রেগে উঠে ছিলেন, 'উঃ কী জ্বালা! জগতে এত জীব সৃষ্টি করলাম, এই মানুষগুলোর মত এত আবদেরে বায়নাবাজতো আর একটা দেখলাম না। বাঘ সিংহী হাতী উট সাপ ব্যাং মাছ, সবাইতো আমার সন্তান, তারা কে কবে আবদার করছে, 'মা আমার এই করে দাও, ওই করে দাও, তাই করে দাও!'...আর ওই মানুষ, রাতদিন ডাকাডাকি, আর 'দাও দাও। 'মা আমার অসুখ ভাল করে দাও, আমার বাড়ি করে দাও, গাড়ি করে দাও, ছেলেমেয়েদের পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দাও, বড় চাকরী করে দাও, ভাল বিয়ে দিয়ে দাও, আমায় মান দাও, যশ দাও রাজা করে দাও, মন্ত্রী করে দাও, লিস্টি ফুরোবে না। আবার মামলা মকদ্দমাতেও জিতিয়ে দাও? উঃ।'

বিজয়া গোমড়া মুখে বলেছে, তা যাকে যা শিখিয়েছ মা, সে তাই শিখেছে। অন্য সব জীব জন্তুকে 'ডাক' ছাড়া আর কিছুই শেখাওনি, তারা সেই ডাকই ছাড়ে, ঘৌ ঘৌ, মিউ মিউ হিঁহি হিঁহি, হাম্বা হাম্বা! মানুষকে তুমি ডাকতে শিখিয়েছ, সে তাই করছে। রাতদিন ডাকছে। শুধু শুধু কি আর ডাকবে, তাই 'দাও দাও' করছে।'

মা দুর্গা রেগে বলেছেন, 'খুব যে কথা শিখেছিস? বছর বছর পৃথিবীতে গিয়ে এইটি হয়েছে, তা' যে ডাকছে, সে করে কী?'

বিজয়া খড়ি পেতে বলে, 'চায়ের ব্যবসা।'

মা দুর্গা চমকে বলেন, 'অ্যাঁ, বলিস কী?'

'হ্যাঁ মা, শুধু ব্যবসাই নয়, তিন চারটে চায়ের বাগানও আছে তার।'

মা দুর্গা রেগে বলেন, 'আর এই লোককে তুই অগ্রাহ্য করছিস? ওকে জিতিয়ে দিতে পারলে জীবনে আর তোকে পৃথিবী থেকে চা বয়ে নিয়ে আসতে হবেনা। যা—গিয়ে স্বপ্নাদেশ দিবি, ভয় নেই, তোকে জিতিয়ে দেব, তুই শুধু নিয়মিত আমায় চা সাপ্লাই করবি। মানে চায়ের পাতা দিয়ে পুজো দিবি।'

এতক্ষণে বোধহয় বুঝতেই পারছ, মা দুর্গা ওই চায়ের অভ্যাসটিই করে মরেছেন।

বিজয়া যখন মা দুর্গার শক্তি কণিকা নিয়ে মর্তে নামতে যাচ্ছে, নন্দীর সঙ্গে দেখা। এ বলে 'কী ব্যাপার?... ও বলে কী ব্যাপার?'

তারপর বোঝা গেল ব্যাপার. লড়াইটা শেষ পর্যন্ত শিবের সঙ্গে দুর্গার গিয়েই ঠেকছে!

বিরিঞ্চি ঘোড়েল হয়েছে শিবাশ্রিত. পশু ঘোড়েল দুর্গাশ্রিত। দুই জ্ঞাতি ভাই। একখানা তালুক নিয়ে লড়া-লড়ি। এ বলে, 'ও তালুক আমার সাত পুরুষের,' ও বলে, 'ও তালুক আমার সাত পুরুষের।'... অথচ মিথ্যে কেউই বলেনা,

সাত পুরুষ আগের সেই চন্দ্র-বিন্দু হয়ে যাওয়া ভদ্রলোক? যিনি গাঁটের কড়ি খরচা করে কিনেছিলেন ওই জমিটি, সেই রজনী ঘোড়েল? তিনি এই পশু ঘোড়েলেরও ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা, আবার বিরিঞ্চি ঘোড়েলেরও ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা অতএব এদের দু'জনেরই সমান দাবি।...রজনী ঘোড়েলের দুই ছেলের বংশ দু' দিকে ছড়িয়ে এখন জ্ঞাতি শত্রুর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই—জমিটার অধিকার নিয়ে ঘোর মকদ্দমা।

এ বলে, 'পানের চাষ আরো বাড়ানো দরকার ওই জমিটায় ভাল হবে।'

ও বলে, 'শুধু পাহাড়ে দেশেই চা বাগান হয়, বর্ধমান জেলার মাটিতে বাগান হওয়ানো যায় কিনা, তার পরীক্ষা করব। জমি না হলে কোথায় পরীক্ষা? পুকুরের জলে?' দু'জনেরই

যুক্তি আছে।

রাত্তিরে যে যার বাড়িতে ঘুমোচ্ছে হঠাৎ বিরিঞ্চি ঘোড়েলের মাথার কাছে দেববাণী, 'ওরে বিরিঞ্চি, নির্ভয়ে থাক, স্বয়ং বাবা ভোলানাথ তোর সহায়। তোর জিৎ মারে কে?

ওদিকে পঞ্চু ঘোড়েলের মাথার কাছে তেমনি দেববাণী, শুধু হেঁড়ে গলায় নয়, মধুর কণ্ঠে, 'বাছা পঞ্চু, নির্ভয়ে থাক্, তোর জয় মারে কে? আমি তোর জয়ের জন্যে আমার অনুচরী বিজয়াকে পাঠিয়েছি, আমার শক্তি দিয়ে। শুধু একটি শর্ত—।

পঞ্চু ধরফড়িয়ে উঠে বসে দিশেহারা হয়ে বলে, 'কী শর্ত মা, কী শর্ত?'

'পরে বলব, আগে জেৎ।'

ব্যস! পরের দিন দুই জ্ঞাতি ভাই পুকুর ধারে তড়পাচ্ছে, এ বলে, 'মা স্বপ্নে আমায় ভরসা দিয়ে গেছেন, আমার জেতা মারে কে?'

ও তড়পাচ্ছে; 'বাবার ওপর কথা নেই, বাবা মায়ের গুরুজন, বাবা আমায় স্বপ্নে আশ্বাস দিয়ে গেছেন না জিতিয়ে ছাড়বেন না। ও জমি আমার হকের ধন মদন মোহন।'

দুর্গাশ্রিত পঞ্চু বলল, দেখা যাক কার হকের ধন।'

চলছে লড়ালড়ি।

দিনের পর দিন শুনানি চলছে উকিল ব্যারিস্টার হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে. জজ মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকছেন। কারুর হারজিৎ নেই, কারুরই কেস দুর্বল নয়, দু'জনেরই সাত পুরুষের জমি।

কোর্ট কাছারি নাস্তানাবুদ।

একদিকে বাবার বিভূতি, অন্যদিকে মায়ের শক্তি। নন্দী আর বিজয়া দুজনেই যে যার মালিককে নিয়মিত ট্রাঙ্ককলে খবর দিচ্ছে, মামলার অবস্থা কি, কিন্তু হেলা দোলা নেই কারুর!

রেগে গিয়ে শিব বলেন, 'দুর্গা, এটা কী হচ্ছে? তোমার শক্তি সংবরণ কর। আমার ভক্তকে জিতিয়ে না তুললে নরলোকে আর প্রেস্টিজ থাকবে আমার?'

'দুর্গাও জেদ ধরে বলেন, 'সে আমি কি জানি? আমারই বুঝি প্রেস্টিজ রাখবার দরকার নেই? চিরটাকাল আমি শরণাগত দীনার্ত, পরিত্রাণ পরায়ণে—তা জানো না?'

শিব দুর্গার তর্কাতর্কির রোল কৈলাস থেকে স্বর্গে গিয়ে ওঠে, তেত্রিশ কোটি দেবতা ছুটে এসে হাজির হন। কী হয়েছে?

ওঁরা তো তখন উত্তেজিত, শিবঠাকুর আর মা দুর্গা! জয়া আর ভৃঙ্গী, ঘটনার আদ্যন্ত রিপোর্ট দেয়, এবং নিশ্বাস ফেলে বলে, 'ব্যাপার মিটবে কী করে? মা বাবা দুজনেই সমান, কেউ তো কম যাননা? আজ যদি এ জিতবো জিতবো করে, কাল ও তেড়ে ওঠে। রোজ নতুন নতুন উকিল আনছে।'

'এত সব টাকা কড়ি পাচ্ছে কোথায়?'

'ওরাই জানে।'

তাইতো!

তেত্রিশ কোটির এক আলোচনা সভা বসে, কী করে মা বাবা' দুজনেরই মান বজায় থাকে। কারণ মা দুর্গা বলেছেন, 'আমার ভক্ত হারলে আমরণ অনশন করব।' আর শিব ঠাকুর বলেছেন, 'আমার ভক্ত না জিতলে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড লণ্ডভণ্ড করে ছাড়ব।'

দুটোই সমান ভয়ের।

তেত্রিশ কোটি ভেবে হিমসিম, এমন সময় যমরাজের প্রবেশ। ডিউটিতে ছিলেন, আসতে দেরী হয়ে গেছে। বিবরণ শুনে স্রেফ্ উড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'এই কথা? সব সমস্যার সমাধান আমার হাতে। মা বাবা দুজনেরই মান বজায় থাকবে। কালই আমার মোষটাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—'

'কোথায়? কোথায়?'

কেন পৃথিবীতে, আদালতের সামনে রাস্তায়!'

দেবতাদের কথা অমোঘ, পরদিনই হয়ে গেল সমস্যার সমাধান। বিরিঞ্চি আর পঞ্চু দু'জনে একই সঙ্গে আদালত থেকে বেরিয়ে দু'জনে দুজনকে কলা দেখিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে হাসছে, হঠাৎ চোখে অন্ধকার, কোথা থেকে যেন কালো মেঘের চাঁইয়ের মত বিশাল এক মোষ ছুটে এসে দু'জনের ওপর দিয়েই 'পাস' করে চলে গেল। দুজনেই স্রেফ্ কাদা!

রাস্তার লোকে তুলে হাসপাতালে পাঠাতে গিয়ে বুঝে পায়না কোনটা কার হাত পা।

গভীর অন্ধকার থেকে আস্তে আস্তে যখন আলোয় চোখ মেলল বিরিঞ্চি পশুপু, কিছুই চিনতে পারেনা। ...কী এ? আদালত? বাড়ি? হাসপাতাল? উঠে বসতে যেতে দেখল পশুপুর মাথার কাছে মা দশভুজা, বিরিঞ্চির মাথার কাছে জল্পেশ্বর শিব।

শিব বললেন, 'বাবা বিরিঞ্চি, কোনো কষ্ট হচ্ছে?'

'বুঝতে পারছিনা প্রভু।'

'তুমি কে মনে আছে?'

'কী আশ্চর্য মনে থাকবেনা? আমি বিরিঞ্চি ঘোড়েল, পানের কারবারি, দেশে বরজ লাগাব বলে জমি নিয়ে—'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। সামান্য নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়ায় কাজ কি? এই দ্যাখো, অগাধ অফুরন্ত জমি পড়ে আছে, সব তোমার। শত শত পানের বরজ লাগাও।'

বিরিঞ্চি রেগে বলে, 'বললে তো ঠাকুর, এত জমির খাজনা দেব কোথা থেকে?'

'আহা খাজনা টাজনা তোমায় দিতে হবেনা, তুমি শুধু প্রতিদিন আমার ওখানে কিছু করে পান পাঠিয়ে দেবে—'

'বিরিঞ্চি উপুড় হয়ে পড়ে বলে, —সে আর বলতে, সে আর বলতে!... কিন্তু প্রভু এই জায়গাটা কী?'

'কী আশ্চর্য! বুঝতে পারছনা, কৈলাস।'

'বুঝবো আর কী করে? কৈলাসে তো হরঘড়ি আসা যাওয়া নেই। তা' হঠাৎ এখানে এসে পড়লাম কী করে?'

বাবা মৃদু হেসে বলেন, সে কথা জিগ্যেস কোরোনা বৎস! তবে তোমার কারবারের বাড়বাড়ন্ত করতে একটি বুদ্ধি দিই—তোমার ওই পান থেকে একদিন ছত্রিশ কোটি খিলি পান ভাল করে সাজিয়ে তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীকে দুটো দুটো খাইয়ে দিও। তারপর দেখো।'

ওদিকে পশুপু ঘোড়েলের সঙ্গেও মা দুর্গার কথাবার্তা চলছে। মা দুর্গাও বলেছেন, 'ওই কৈলাস শিখরে অফুরন্ত জায়গা পড়ে আছে, যত পারিস চা বাগান কর বৎস, শুধু একটি শর্ত—আমায় নিয়মিত চা সাপ্লাই করবি। রান্নাঘরের কোণে বসে লুকিয়ে লুকিয়ে খেতে আর ইচ্ছে নেই। ভাল চায়ের জোগান দিবি, মাঝে মাঝে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীকে ডেকে টী পার্টি দেবো। বুঝুন ওঁরা আমার বাপের বাড়ির দেশের খাওয়া দাওয়াটি কেমন।'

পশুপু মহোৎসাহে বলে, ভাল চা যদি বলেন মা, এক্ষুণি টী পার্টি লাগিয়ে দিতে পারেন। শুধু যদি একটা ইয়া লম্বা আঁকশি পাই।'

'আঁকশি!'

মা দুর্গা আকাশ থেকে পড়েন, 'আঁকশি কী হবে।'

পশুপু ঘোড়েল একটু ঘোড়েল হাসি হেসে বলে, উঁহু নীচুতে দার্জিলিঙে—আমার দু' দুখানা চা বাগান পড়ে রয়েছে, ও দুটোকে টেনে তুলে আনবো। বিস্তর দেনাপত্তর করে এসেছি, শেষে আবার পাওনাদারেরা বেচে কিনে নিয়ে নেবে। তার আগেই রাতারাতি—'

মা দুর্গা অবাক হয়ে বলেন, 'আঁকশি দিয়ে গোটা দুটো বাগান তুলে আনতে পারবি?'

পশুপু গলবস্ত্র বলে, 'তোমার দয়া আর তোমার আঁকশি, এ পেলে গোটা পৃথিবীখানাই তুলে আনতে পারি মা, তা তুচ্ছ দু'খানা বাগান?...নাও বার-কর আঁকশি, আজই লাগিয়ে দাও টী পার্টি।'

যে কথা সেই কাজ, লম্বা এক আঁকশি লাগিয়ে চা বাগান দুখানা তুলে আনল পশুপু। একেবারে কুলি কামিন, মায় তাদের ঝুড়ি চুবড়ি সমেত!... নিজের বাগান নিজের লোকজন, চিনতে ভুল হয়না। তাছাড়া কৈলাসের একেবারে সরাসরি নীচেই তো দার্জিলিং, অসুবিধে হলনা টেনে তুলতে।

টী পার্টি দিলেন মা দুর্গা, খেয়ে তেত্রিশকোটি দেবতা একেবারে বিভোর। ঝপাঝপ টন টন চায়ের অর্ডার দিয়ে ফেললেন পশুপুকে।

ওদিকে বাবা ভোলানাথও বসে নেই, তিনি বিরিঞ্চিকে তাতাচ্ছেন, বিরিঞ্চি, আবারও যে সেই হারা জেতা! ...পশুপু জিতে যাচ্ছে—'

বিরিঞ্চি মুচকি হেসে বলে, ক্ষ্যাপা ঠাকুর, ক্ষেপেছেন? পশুর চাল আমি টের পাইনি? আগেই নন্দী ভৃঙ্গী দুই দাদাকে পাঠিয়ে আমার বারুইপুরের তিনখানা বরজই উপড়িয়ে আনিনি?... ছত্রিশ কেন একেবারে বাহাত্তর কোটি খিলি পান মজুত রেখেছি, টী পার্টির শেষে মুখশুদ্ধির জন্যে। দেবতা পিছু এক গণ্ডা করে পান ধরে দেব।'

যে কথা সেই কাজ!

পানও ফেলনা হলনা। সে নিয়েও দেবদেবী মহলে কাড়াকাড়ি, আর অর্ডার দেওয়া দিইর হুড়োহুড়ি।

তদবধি কৈলাসে চা আর পানের চলন। মরে অমর হয়ে যাওয়া পশুপু আর বিরিঞ্চি, সমস্ত কৈলাস ক্ষেত্র জুড়ে চায়ের বাগান, আর পানের বরজ করে ফেলে অবিরত তাদের তস্বির করে চলেছে, আর যাঁরা খাবার, তাঁরা খেয়ে চলেছেন।

ছবি এঁকেছেন ॥ সুধীর মৈত্র

পৃথিবীর শূন্যস্থান

পৃথিবীতে এক মজার জায়গা আছে। না-অক্ষাংশ, না-দ্রাঘিমার সেই দেশ কোন হিসেবের মধ্যে পড়ে না। তাকে বলা যায় পৃথিবীর শূন্যস্থান। গ্রীনউইচের মৌলিক মধ্যরেখা নিরক্ষ রেখার যেখানে এসে মিশেছে, সেই সন্ধিস্থল হল না-অক্ষাংশ, না-দ্রাঘিমার দেশ। আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল থেকে দূরে, সব কিছু থেকে মাইলের পর মাইল তফাতে গিনি উপসাগরে সেই সৃষ্টিছাড়া শূন্যরাজ্য। তার কাছাকাছি জায়গা? একটা আছে বটে। কিন্তু সেটাকেও ঠাট্টা করে বলা হয়—এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি। কারণ কোন জায়গা থেকেই সেই জায়গা কাছাকাছি নয়। তবু এরই মধ্যে কাছাকাছি জায়গাটি হল ডিয়েকোড-এ: ব্রিটিশ স্বর্ণ উপকূল উপনিবেশ এবং স্বর্ণ উপকূল উপনিবেশের রাজধানী আক্রার মাঝামাঝি। ৫° ৩১′ উত্তরে ০° ১২′ পশ্চিমে সেই নিকটস্থান। সমুদ্রপৃষ্ঠে অবস্থিত এই অদ্ভুত জায়গাটির অক্ষাংশ নেই, দ্রাঘিমা নেই, সেই সঙ্গে উচ্চতাও নেই।

অঙ্কের মজা মজার অঙ্ক

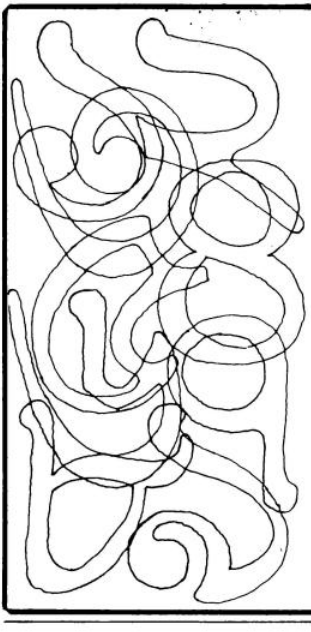

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৯—এই সংখ্যাটাকে দিয়ে কী করে ৬ এর ছড়াছড়ি, ৮ এর অট্টহাসি কিংবা ৫-এর পাঁচালি বানানো যায়, তোমরা নিশ্চয়ই শিখে ফেলেছো। আর বন্ধুদের অবাক করে দিয়েছো।

আগের বার আমরা বলেছিলাম অংক ৯ দিয়ে অনেক মজা করা যায়।

এসো, ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৯—এই সংখ্যাটা আর ৯ নিয়ে একটু মজা করি।

প্রথমে নটা ৯ পরপর লিখে ফেলো। তারপাশে গুণের চিহ্ন দিয়ে লেখো ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৯। অর্থাৎ অংকটা হল ৯৯৯৯৯৯৯৯৯ × ১২৩৪৫৬৭৯। এটাকে উল্টো করে লিখলে গুণের কিছু সুবিধে হবে, কেননা ১২৩৪৫৬৭৯-কে ৯ দিয়ে গুণ করলে কত হয় আমরা তো জানিই।

সুতরাং অংকটা লিখবো এই রকম ঃ

```
          ১২৩৪৫৬৭৯
        ×৯৯৯৯৯৯৯৯৯
--------------------
          ১১১১১১১১১
         ১১১১১১১১১
        ১১১১১১১১১
       ১১১১১১১১১
      ১১১১১১১১১
     ১১১১১১১১১
    ১১১১১১১১১
   ১১১১১১১১১
  ১১১১১১১১১
--------------------
১২৩৪৫৬৭৮৯৮৭৬৫৪৩২১
```

উত্তরের মজাটা দেখেছো? ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সোজাসুজি তারপরে উল্টোভাবে ১ পর্যন্ত। যেন হ্যালো...হ্যালো... মাইক টেস্টিং। আর গুণের মাঝখানে? ১ এর একাকার।

এরকম গুণের অঙ্ক এলে চোখ বুজে উত্তর করে দেওয়া যায়। যায় না? ১২৩৪৫৬৭৯ দিয়ে আরও বহু মজা আছে।

শুভংকর

ম্যাজিকের মত পার্থসারথি চক্রবর্তী

তুমি একটা আশ্চর্য মজার বোতল তৈরি করতে পার—যেটা থেকে অনবরত জল বেরোবে অথচ সেই জলের বেগ কখনও কমে যাবে না। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা অসম্ভব বলে মনে হতে পারে, কিন্তু সত্যি এই মজার বোতল তৈরি করা যায়।

এই আশ্চর্য বোতলে কি কি থাকবে, এসো এবার দেখি। এর খোলা মুখের ছিপির মধ্য দিয়ে একটি সরু কাঁচের নল ঢুকান আছে। বোতলের ক, খ, গ এই তিনটে ফুটো রয়েছে কর্কের ছিপি দিয়ে আঁটা। 'গ' মুখটি খোলার সাথে সাথে বোতলের জল সেখান দিয়ে সমান বেগে বেরোবে যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ জল কমে কাঁচের নলের তলায় চলে না আসছে। এবার কাঁচের নলটি বোতলের আরও নীচে 'গ' মুখের কাছে নিয়ে গেলে দেখবে সেখান থেকে সমস্ত জল সমান বেগে বেরিয়ে আসছে।

ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত শোনাচ্ছে, নয় কি? আচ্ছা এস, কি করে এটা হল তা এবার ভালো করে দেখা যাক্। বোতলের 'গ' মুখ থেকে যতই জল বেরিয়ে যাবে ততই জলের উচ্চতা কমতে থাকবে। এদিকে সরু কাঁচের নলের মধ্য দিয়ে বাতাস ঢুকে জলের উপরে বোতলের মুখের নীচে গিয়ে জমা হবে। তাহলে 'খ' মুখের উপর সম্পূর্ণ জলের স্তরটিকে ভিতরের বাতাস চাপ দিচ্ছে। বাতাসের চাপ বোতলের ভিতরে ও বাইরে একই বলে এবং 'খগ' স্তরের চাপের জন্য এবার 'গ' মুখ দিয়ে জল বেরোতে থাকবে। আবার যেহেতু 'খগ' স্তরের উচ্চতা সমান তাই জল 'গ' মুখ দিয়ে সমান হারে বেরিয়ে আসবে, সন্দেহ নেই।

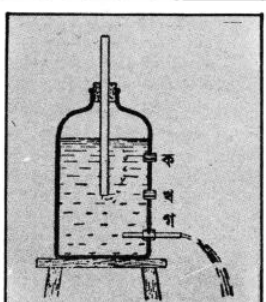

এই বোতলের আরও দুটো মজার ভেলকিবাজী দেখিয়ে তুমি সবাইকে অবাক করে দিতে পার। 'খ' মুখটি খুলে দিলে কি হবে বলত? ওখান দিয়ে কিন্তু জল বেরোবে না মোটেই, অবশ্য যদি তার ফুটোটা খুব ছোট হয়। আবার যদি 'ক' মুখ খুলে দাও তাহলে দেখবে বোতল থেকে জল তো বেরোচ্ছেই না, উপরন্তু তার ভিতরে বাতাস ঢুকছে। এর কারণ হল 'ক' মুখের কাছে বাতাসের চাপ বাইরের বাতাসের চেয়ে কম। বোতলটা সত্যি সত্যিই খুব মজার, তাই নয় কি?

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

পিসীমার পোষা বাঘ

আমার স্কুলের বন্ধুরা বিশ্বাস করে না, কিন্তু তোমরা ভাই নিশ্চয় করবে। আমার পিসীমার বাড়িতে একটা পোষা বাঘ আছে। সত্যিকারের বাঘ—পটুদা স্বচক্ষে দেখেছে। বাঘটা বাড়িতেই থাকে। চেন-টেন দিয়ে বাঁধা নয়, একেবারে খোলা। ঘরের কাজকর্ম করে। পিসীমারই ঘরের মেঝেয় মাদুর পেতে শোয় রাত্তিরবেলা।

পিসীমা বলেন, ঘুসুড়ির মহারাজা রায়বাহাদুর নিঃশেষ চৌধুরী বাঘটা তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, বৌঠান আমরা নিমিত্ত মাত্র এ শিকার আপনার প্রাপ্য। আসলে স্বর্গত পিশেমশায়ের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন মহারাজা। তাঁর লনড্রিতে মহারাজার সমস্ত খাকির জামা-প্যান্ট, ধুতি পাঞ্জাবি ধোলাই হতে আসতো। সেই সুবাদে ঘনিষ্ঠতা।

কিন্তু পটুদা বলে, ওটা পিসীমার বিনয়। সত্যি খবর তো চাপা থাকে না। চার পাঁচ বছর আগের ঘটনা। পিশেমশাই তখন বেঁচে নেই।

একদিন মহারাজা আপিশ-ফেরত পিসীমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। বললেন, সুন্দরবনে শিকার করতে যাচ্ছি, যদি বাঘে খায় তা হলে আর ফিরবো না। তাই ভাবলাম—। পিসিমা বললেন, আমাকেও নিয়ে চলো না ঠাকুরপো, সুন্দরবনে কখনো যাই নি। না জানি কী সুন্দর জায়গা!

মহারাজা নিঃশেষ চৌধুরী তো শুনে আকাশ থেকে পড়লেন। সে কী করে সম্ভব। শিকারে গেলে যে খাকির হাফ প্যান্ট পরতে হয়।

পিসীমা বললেন, সে আমি লনড্রি থেকে একটা বেছে নেবো।

—খাকির হাফ শার্ট?

—যোগাড় হয়ে যাবে।

—চামড়ার বেল্ট?

—তোমার দাদার একটা আছে; আমায় ফিট করবে।

মহারাজা বললেন, বন্দুক তো আমার আছে, আপনি তো চালাতে জানেন না! শেষকালে একজন মহিলা, বেঘোরে—

পিসীমার ভালো নাম জগদম্বা। তিনি এত অল্পে ছাড়বার পাত্রী নন। বললেন, যেতে-যেতে শিখে নেবো।

নৌকো থেকে নেমে, সারাদিন হেঁটে, গ্রাম-ট্রাম ছাড়িয়ে ওঁরা গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলেন। মানুষের পায়ের শব্দে মশারা ভনভন করে উঠলো, পাখিরা কিচমিচ করে উঠলো, বাঁদরেরা খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠলো। কাঁটা লেগে হাঁটুর চামড়া ছিঁড়ে গেল মহারাজার। হাঁটতে হাঁটতে হাঁপিয়ে পড়লো ওঁদের সঙ্গী হাবিলদার সদুকমু সিং। পিসীমার ভ্রূক্ষেপ নেই। গ্রামের যে লোকটা পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তাকে শুধু একবার জিগ্যেস করলেন, বাঘের গন্ধ পাচ্ছি না যে!

লোকটা বললো, টোপ রাখা থাকবে আপনাদের মাচানের নিচে, গন্ধ পেয়ে

রাস্তিরে এক সময় ঠিক এসে পড়বে দেখবেন হুজুর।

—কিসের টোপ? পিসীমা জানতে চাইলেন।

লোকটা বললো, ছাগল।

মাচানের ওপর তিনজন, মাচানের নিচে ছাগলটা। সারা রাত অপেক্ষা। বাঘ-টাঘ এল না। পিসীমা ক্রমশ বিরক্ত হয়ে উঠছেন। হাবিলদার হৃদকম সিং-এর যতোবার নাক ডেকেছে, পিসীমা বকুনি দিয়েছেন—শাট আপ! ছাগলটা দু একবার ব্যা-ব্যা করে উঠেছিল, পিসীমা তাকেও বকেছেন ওপর থেকে—শাট-আপ্!

এই ভাবে ভোর হয়ে গেল। গভীর জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে বন্দুকের গুলির মতো নিঃশব্দে সূর্যের আলো এসে বিঁধলো একটা দুটো। জপ করতে করতে পিসীমা হঠাৎ লক্ষ করলেন, ছাগলটা কাৎ হয়ে পড়ে আছে। জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে, চোখ দুটো খোলা। তার মানে, ঘুমোয় নি, আবার বেঁচেও আছে। বুঝলেন, ছাগলটার মাথা ধরেছে। কারুর জন্যে অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করলে মাথা ধরে ওঠে, পিসীমা জানেন।

দুটো হাঁটুর মাঝখানে ছোট আয়না রেখে ঘুসুড়ির মহারাজা দাড়ি কামাচ্ছিলেন। একটা গাল তখন বাকি, এমন সময় তিনি ফিশফিশ করে চেঁচিয়ে উঠলেন, ওই তো, ওই দিকে!

পিসীমা দেখলেন, হৃদকম্ সিং দেখলো, একটু দূরে আলোছায়া মতো কী একটা নড়ছে। এগিয়ে আসছে আস্তে আস্তে। মৃদু মৃদু বোটকা গন্ধ ধূপের ধোঁয়ার মতো ধীরে ধীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে জায়গাটায়।

মাথা-ধরা থেকে ছাগলটা লাফিয়ে উঠলো।

হৃদকম সিং বগলের বন্দুকটা বাগিয়ে ধরেছে টাইট করে। মহারাজার একটা দোনলা বন্দুক। আর একখানা পিসীমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

পিসীমার হাত জোড়া। জপ শেষ হয় নি তখনও। বললেন, এখন থাক।

যেই না বাঘের উঁচু করা লেজটা দেখা গেছে আর অন্য দুজন ওর মাথাটার দিকে টিপ ঠিক করছেন, এমন সময় পিসীমা হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন, লজ্জা করে না? অসভ্য!

বাঘটা থতমত হয়ে প্রথমে এদিক-ওদিক, তারপর মাচানের ওপরে বসা পিসীমার রাগী এতবড়ো মুখখানার দিকে চেয়ে দেখলো।

পিসীমা আবার গর্জন করে উঠলেন বনের রাজা তুমি, ন্যাংটো হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ? লজ্জা করে না! ছিঃ!

এবার বাঘটা লেজের ওপর বসে পড়লো চুপ করে। মাথা নিচু। কারুর বুঝতে বাকি রইল না, ও খুব লজ্জা পেয়েছে।

পিসীমা তরতর করে মাচান থেকে নামলেন। তারপর কান ধরে বাঘটাকে হিড় হিড় করে টানতে টানতে এদিকে নিয়ে এলেন। হেঁকে বললেন, হৃদকম্পো, একগাছা দড়ি দাও।

হৃদকম্ সিং দূরে থেকে দড়ি গাছা ছুঁড়ে দিল। মহারাজা নিঃশেষ চৌধুরী আর পিসীমা দুজনে মিলে বাঘটাকে জমপেশ করে বাঁধলেন।

জেনুইন রয়্যাল বংগাল আছে, হৃদকম্ সিং বললো, তা না হলে বাংলা কথা বোঝে!

আঁচলের অভাবে শুধু হাত দিয়েই নাক চাপা দিলেন পিসীমা। বাঘটার দিকে তাকিয়ে আবার ধিক্কার দিলেন, কী দুর্গন্ধ, বাপ্, চল্, তোকে আগে সাবান দিয়ে চান করাবো।

মহারাজা বললেন, এ শিকার আপনারই প্রাপ্য। আপনি বাড়ি নিয়ে যান বৌঠান।

দুই

পটুদা নিজের মুখে আমায় বলেছে, তোমরা বিশ্বাস করো, যে মাধাই একদম বদলে গেছে এখন। মাধাই সেই রয়েল বেঙ্গল টাইগারের নাম।

পিসীমা রোজ ওকে চান করিয়ে দেন। শীতকালে গরম জল দিয়ে, আর গরম কালে ঠাণ্ডা জল দিয়ে দুবেলা। রোজ সকালে দাঁতন দিয়ে দাঁত মাজিয়ে দেন। প্রত্যেক রবিবার পিসীমা নিজে নখ কাটেন, মাধাইএরও নখ কেটে দেন। চান করার পর বাথরুম থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে ওকে প্যান্ট পরতে হয়, ও আপত্তি করে না। পাড়ার লোকেরা বলে, জগদম্বা দেবী যেভাবে মাধাইকে মানুষ করেছেন, নিজের ছেলেকেও কেউ তা পারে না।

অবশ্য মাধাইয়ের মতো ছেলেও আমাদের দেশে খুব বেশি নেই। আমরা খেতে বসে কত রকম বায়না করি। পটল খাবো তো বেগুন খাবো না!

দুধ খাবো তো সর খাবো না। অড়হর ডালে বিচ্ছির গন্ধ, কলাইয়ের ডাল কেমন নাল-মাখা, ঘেন্না করে। তাই না?

অথচ মাধাই, রয়েল বেঙ্গল বাড়ির ছেলে, নাকি সব খায়। পটুদা স্বচক্ষে দেখেছে, পিসীমার পাশে বসে ও ঝিঙ্গে-পোস্তো দিয়ে ভাত কী রকম চেটে-পুটে খায়। একাদশীর দিন ফলমূল খেয়ে থাকতে ওর একটুও অসুবিধে হয় না। শুধু মাঝে মাঝে যখন ওর দাঁত সুড়সুড় করে হাড় চিবোবার জন্যে, তখন পিসীমা ওকে এক টুকরো আখ খেতে দেন। ও তাতেই খুশী। তোমরা স্বীকার করবে, মানুষ হয়ে জন্মালে মাধাই দেশের মুখ উজ্জ্বল করতো।

আমি নিজেও মাধাইকে দেখেছি। যেদিন ক্যালেন্ডার দিতে গিয়েছিলাম। ইংরেজী-বাংলা দু-রকম তারিখ দেওয়া ক্যালেন্ডার পিসীমার কাজে লাগে। এবছর কাগজের অভাবে ক্যালেন্ডার তো খুব কমই ছাপা হয়েছে। তবু বাবা অনেক কষ্ট করে তিনটে ক্যালেন্ডার ম্যানেজ করতে পেরেছিলেন। তার মধ্যে একটাতে ছিল প্রকাণ্ড বাঘের মুখ। কোনো কাগজ-কলের ক্যালেনডার। ভাবলাম, পিসীমাকে দিয়ে আসি, উনি তো বাঘ ভালোবাসেন।

পেয়ে তো পিসীমা খুব খুশী। তখনই দেয়ালে টাঙিয়ে দিলেন। আমার বাড়ির তৈরী সন্দেশ খাওয়ালেন। বললেন, কতদিন পর এলি! পিসিকে একেবারে ভুলে গোছস তোরা।

আমি বললাম, আসল কথা তা নয় পিসীমা। আসতে আমার ভয় করে। আপনার পোষা বাঘটা যদি—

—কে, মাধাই? কী যে বলিস! ওর মতো ছেলে হয় না।

তারপর ভেতরের দরোজার দিকে মুখ ঘুরিয়ে খুব আদরের গলায় ডাকলেন, বাবা মাধাই, এদিকে আয় তো একবার।

মিউ করে একটা শব্দ এল ভেতর থেকে।

পিসীমা বললেন, আচ্ছা, হাতের কাজ সেরেই আয়।

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, ঘর মুছছে, এখুনি আসবে। দেখবি, কী শান্ত ছেলে ও।

একটু পরে দরোজার পর্দা ফাঁক করে যে ঢুকলো তাকে দেখে আমি অবাক। একটা শাদা রঙের বেড়াল; সাধারণ বেড়ালের চেয়ে একটু বড়ো। পরনে একটা ঢলঢলে জাঙিয়া। লম্বা লেজ, তার ডগায় একটা ভিজে ঝাড়ন জড়ানো। টুকে একবার পেছনের দু-পায়ে ভর করে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো, পারলো না। তারপর পিঠ সোজা করে বসলো পিসীমার পায়ের কাছে। অনেক দিন নিরামিষ খাওয়ার ফলে বাঘটার চেহারায় একটা স্নিগ্ধ ভাব ফুটেছে।

বসে বসেই সামনের দেয়ালে টাঙানো নতুন ক্যালেনডারটার দিকে চোখ পড়লো ওর। অনেকক্ষণ চেয়ে রইলো একদৃষ্টে ছবির হিংস্র মুখটার দিকে। ঝাড়ন বাঁধা লেজটা মেজেতে ঝাপটালো দু বার। ওর পেটের ভেতর থেকে কেমন গরগর গরগর করে একটা শব্দ উঠে আসছে, আমার মনে হোল।

তারপর দেখলাম, শব্দ নয়, জল। ওর চোখ দুটো দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে।

পিসীমা মাধাইকে কোলে তুলে নিলেন। ওর পরিষ্কার শাদা লোমে, নখহীন থাবায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন। ওর দাঁতন দিয়ে মাজা পরিচ্ছন্ন মুখটার কাছে মুখ এনে চুমো খেলেন। বললেন, লক্ষ্মী, সোনা আমার। যাও, ভেতরে যাও। তারপর ক্যালেনডারটা নামিয়ে নিলেন দেয়াল থেকে।

ছবি এঁকেছেন ॥ পূর্ণেন্দু পত্রী

বিন্দু বিসর্গ

একদিন সুনীতি দেবী রবীন্দ্রনাথকে বললেন—একটা ভূতের গল্প বলুন। আপনি নিশ্চয়ই ভূত দেখেছেন।

অগত্যা রবীন্দ্রনাথ একটা কাহিনী বলতে রাজি হলেন।

কাহিনীর আরম্ভ একটা পার্টি থেকে ফিরতি পথে।

অনেক রাত। একখানা মাত্র ভাড়াটে গাড়ি চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

গাড়ি চলতে শুরু করল। খানিক পরে রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন, গাড়িটা চেনা বড় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে না, অচেনা অন্ধকার গলির মধ্যে গাড়ি চলছে। হয়তো, রবীন্দ্রনাথ মনে মনে ভাবলেন, এই গলির পথে জোড়াসাঁকো পৌঁছবার কোনও সহজ উপায় আছে।

কিন্তু পথ আর শেষ হয় না। হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের মনে হল, যেন আরেকজন কে তাঁর গা ঘেঁষে বসে আছে। অন্ধকারে হাত বাড়ালেন রবীন্দ্রনাথ, কোথাও কিছু নেই।

ভাড়াটে গাড়ির পিছন দিকে একটা ছোকরা বসেছিল। রবীন্দ্রনাথ তাকে ডেকে বললেন—ওরে, তুই ভেতরে এসে বোস।

সে রাজি হল না। রবীন্দ্রনাথ তাকে বারংবার ভেতরে এসে বসতে বললেন, একবারও সে ভেতরে এলনা। বারংবার বলল—না বাবু, আমি ভেতরে যাব না।

গাড়ি এতক্ষণে চলে এসেছে গড়ের মাঠে রেড রোডের কাছে। গাড়োয়ানকে ডাকাডাকি করলেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু বৃথা। রাত্রির ময়দানে গাড়িখানা গোল হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। গাড়ির মধ্যে কী একটা জিনিস যেন রবীন্দ্রনাথের গা ঘেঁষে আছে, দু-হাতে যেন সেটাকে ঠেলে ফেলবার চেষ্টা করলেন তিনি। হঠাৎ যেন গাড়ির মধ্যে বিকট একটা হাসির আওয়াজ ফেটে পড়ল। চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ, মাথা ঘুরে গেল। খানিক বাদে বুঝলেন, ভোর হয়ে এসেছে, জোড়াসাঁকোর বাড়ি দূরে নয়।

পরদিন নাটোরের মহারাজাকে রবীন্দ্রনাথ রাত্রির ঘটনা আগাগোড়া বললেন। রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে নাটোরের মহারাজা থানায় চলে গেলেন। সব শুনে থানার দারোগা জিজ্ঞেস করলেন—আপনাদের গাড়ির নম্বর কত?

গাড়ির নম্বর নাটোরের মহারাজা কাল রাত্রে টুকে রেখেছিলেন।

নম্বর শুনে দারোগা বললেন—কাল রাত্রে যদি গাড়োয়ানকে ধরে থানায় নিয়ে আসতেন তাহলে এমন হয়রানি হত না। অনেকদিন আগে একজন কেরানী আপিস থেকে ফিরতি পথে ওই গাড়িতে চেপে গড়ের মাঠে গিয়ে ওই গাড়িতেই আত্মহত্যা করে। সেই থেকে রাত্রে ওই গাড়িতে লোক উঠলেই ভয় পায়।

হ্যাঁ, এই পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, নিজের জবানিতেই বলেছেন। এই পর্যন্ত শুনে কুচবিহারের মহারানী বললেন—অ্যাঁ, সত্যি নাকি?

রবীন্দ্রনাথ হাসলেন। বললেন—না। সত্যি নয়। গল্প।

ইন্দ্রমিত্র

গ্রহ থেকে

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

টুনুকে তার বাবা মামার বাড়ি চালান করে দিল। এ ছাড়া আর উপায়ও ছিল না। ঠিক একমাস পরে টুনুর ম্যাট্রিক পরীক্ষা, আর শহরে গোলমাল শুরু হয়ে গেল।

গোলমাল বলে গোলমাল। শহরের লোকগুলো যেন সবাই এক সঙ্গে খেপে উঠল। সময়ে অসময়ে বোমার শব্দ, গলির মোড়ে মোড়ে একটা দুটো লাশ। আর সে সব লাশ প্রায়ই টুনুর বয়সী সব ছেলেদের।

টুনুর বাবাই বললেন মাকে, শোন, এই আবহাওয়ায় টুনু পরীক্ষার পড়া তৈরি করবে কি করে? তুমি তোমার দাদাকে বরং লিখে দাও, এসে টুনুকে নিয়ে যাক।

মা আপত্তি করেছে, কিন্তু ওই অজ পাড়াগাঁয়ে টুনু থাকতে পারবে?

এছাড়া উপায় কি? দেখছ তো শহরের অবস্থা। পড়াশোনা করবে কি, তার প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে।

অতএব টুনু মামার সঙ্গে হরগোবিন্দপুরে এসে হাজির হ'ল। তাও কি একটুখানি পথ। ট্রেনে তিন ঘণ্টা, তারপর গরুর গাড়ীতে পুরো আড়াই ঘণ্টা। পথ নেই, শেষ ঘণ্টাখানেক শুধু মাঠের ওপর দিয়ে যাত্রা।

গরুরগাড়ী থামতে একটা টিমটিমে লণ্ঠন, গোটা তিনেক লোক টুনুকে অভ্যর্থনা জানাল।

তার মধ্যে একজন মামি, একজন মামাতো বোন আর শেষের লোকটি তুলসীচরণ। একাধারে চাকর, পাচক, মামার দেহরক্ষী।

বাড়ির মধ্যে ঢুকতে গিয়ে টুনুর গা ছম ছম করে উঠল। পুরানো, শ্যাওলাপড়া, ইঁট বের করা একতলা জমাট বাঁধা গুপসি আস্তানা। টুনুর মনে হয়েছিল বাড়িটা বোধহয় পাঠান আমলের। বহু শতাব্দীর ঝড় জল অত্যাচারে আজকের এই ভয়াবহ অবস্থা।

সেই মুহূর্তে টুনুর ইচ্ছা হয়েছিল চিৎকার করে কেঁদে উঠবে। না, মা বাবার জন্য নয়, আলোকিত শহরের জন্য। হোক সে খুনের শহর।

দিন সাতেকের মধ্যে টুনু অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে এল। ভোরবেলা উঠে পুকুরের পাড়ে সবুজ নারকেল গাছের গুঁড়ির ওপর বসে ছাই দিয়ে দাঁত মাজা। তারপর মামাতো বোনের আনা মুড়ি নারকেল সহযোগে চা। সে চায়ের রং আলকাতরার মতন, স্বাদে যেন পাঁচন।

তারপর কোনের ঘরে বই নিয়ে বসা। ইংরাজী, বাংলা, ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক, বীজগণিত, জ্যামিতি। পড়ার যেন আর শেষ নেই।

পুকুরে স্নান, দুপুরে খেয়ে নিয়ে একটু নিদ্রা, তারপর উঠে আবার পড়া। বিকালে তুলসীচরণের সঙ্গে গাঁয়ের পথে একটু হাঁটা। আবার হ্যারিকেনের আলোয় পড়তে বসা।

এর একটু এদিক ওদিক নেই। দিনের পর দিন এক রুটিন।

ওরই মাঝে একটু বৈচিত্র্যও দেখা যায়।

যেমন একদিন পড়তে পড়তে খস-খস আওয়াজে টুনু চমকে উঠেছিল। প্রথমে ভেবেছিল, বাতাসে শুকনো পাতার শব্দ। কিন্তু শব্দটা যেন খুব কাছে।

মুখ তুলে দেখেই টুনুর শরীর হিম হয়ে গিয়েছিল। মাথার চুল সজারুর কাঁটার মতন খাড়া।

বাইরে থেকে জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকছে। দেয়াল বেয়ে। কালো কুচকুচে রং। বাঁশ পাতার মতন সরু চেরা জিভ। লাল রক্তকম্বলের মতন দুটি চোখ।

টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে উঠে টুনু প্রাণপণ শক্তিতে চিৎকার করে উঠেছিল।

তার মামাতো বোন ছুটে ঘরে এসেছিল।

কি হল কি? টেবিলের ওপর দাঁড়িয়েছ কেন?

টুনু ভাল করে কথা বলতে পারে নি। জানলার দিকে আঙুল দেখিয়ে শুধু বলেছিল, সা-সাপ।

মামাতো বোন বিন্দু হেসেই খুন।

জানলার কাঠে আস্তে আস্তে চাপড় মেরে বলেছিল, যা, যা, এখান থেকে। বাইরে কলসিতে যা।

আশ্চর্য কাণ্ড, সাপটা ঘুরে জানলা দিয়ে বাইরে চলে গিয়েছিল।

সাপটা চলে যেতে বিন্দু টুনুর দিকে ফিরে হি-হি করে হেসে বলেছিল, আরে ভয় কি। ওটা বাস্তু সাপ। কোন অনিষ্ট করে না। একজোড়া আছে।

টুনুর ভয় ভাঙে নি। বাবা, একটাতেই রক্ষা নেই, আবার একজোড়া।

একটু একটু করে সব ঠিক হয়ে গেল। ক্রমেই পড়ার চাপ বাড়তে টুনুর অন্য কোনদিকে আর নজর দেবার সুযোগই হল না। অন্য বিষয়গুলো যাওবা একটু তৈরি হয়েছে, ইতিহাস নিয়ে টুনু অথই জলে পড়েছে। বিশেষ করে কয়েকটা ব্যাপার।

বাবর আর হুমায়ুন, কে বাপ আর কে ছেলে কিছুতেই মনে রাখতে পারে না। তাজমহল মমতাজের স্মৃতিচিহ্ন না নুরজাহানের, গোলমাল হয়ে যায়। তাছাড়া ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেছিল শের সাহ, এ কথাটার অর্থ টুনু ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। তার মানে শের সাহের আগে কি ঘোড়া ডাকত না?

উপায় নেই, পরীক্ষা ক্রমেই এগিয়ে আসছে। এখানে পড়ার অনন্ত অবসর। বাড়ি ফাঁকা। কোন গোলমাল নেই।

ভোরবেলা মামা বেরিয়ে পড়ত। মাইল চারেক দূরে তার জমি। চাষীরা চাষ করত, মামা করত তদারক। ধান,

পাট আর তামাক। টুনু বুঝতে পারে না এম এস সি পাশ মামা চাষবাস করে কেন?

মামা যখন বাড়ি ফিরত তখন চারদিক অন্ধকার। দাওয়ায় বসে কিছুক্ষণ ভুড়ুক ভুড়ুক করে তামাক খেয়ে তারপর খেতে বসত।

সারাটা দিন মামি আর মামাতো বোন বিন্দু কাজে ব্যস্ত। দুবেলা খাবার সময় শুধু তাদের সঙ্গে দেখা হ'ত।

টুনুর পড়ার ঘর একেবারে কোণের দিকে। সেটা তার শোবার ঘরও। ছেলে-পিলেদের হৈ হল্লা নেই, শহরের চেঁচামেচি নয়, একেবারে নিঃঝুম।

রাতের বেলা অবশ্য নানারকম শব্দ শোনা যায়। পেঁচার চীৎকার ঝিঁঝির আওয়াজ, প্রহরে প্রহরে শিয়ালের ডাক।

এসব এখন টুনুর গা-সহা হয়ে গেছে। তাছাড়া পড়ার মধ্যে মন চলে গেলে চারপাশের আওয়াজ কানেই আসে না।

একরাতে কিন্তু সব কিছু পাল্টে গেল।

পড়ার বই থেকে মুখ তুলে জানলা দিয়ে দেখেই টুনু আর মুখ ফেরাতে পারল না।

জানালার বাইরে আকন্দ, রাংচিতা, ফণীমনসার ঝোপ। তারপর অনেকটা জায়গা জুড়ে জলা জায়গা। দিনে বকের পাল ঘুরে বেড়ায়, রাতের বেলা মনে হয় কে যেন বিরাট একটা শ্লেট পেতে রেখেছে।

সেই কালো শ্লেটের বুকে দপ করে আলো জ্বলে উঠল। তীব্র আলো। মনে হল এক সঙ্গে বুঝি চল্লিশটা টর্চ টিপে কেউ সংকেত করছে।

টুনু বই ছেড়ে জানলার ধারে সরে এল।

আলোটা আর নেই। জমাট কালো অন্ধকার।

আর্টটা বাজলেই গ্রাম নিশুঁতি। এত রাতে কে এমনভাবে আলো জ্বালবে। বিশেষ করে এত জোরালো আলো।

জানলা থেকে সরে আসতে গিয়েই টুনু দাঁড়িয়ে পড়ল।

আবার সেই আলো। একই রকম কিন্তু ঠিক এক জায়গায় নয়। একটু যেন সামনে সরে এসেছে।

শুধু আলো নয়, আলোর সামনে খোঁচা খোঁচা চুল বেঁটে চেহারার গোটা তিনচার প্রাণী সবেগে মাথা নাড়ছে।

ভাল করে কিছু বোঝবার আগেই দপ করে আলো নিভে গেল।

আধ ঘণ্টার ওপর দাঁড়িয়ে থেকেও টুনু আর আলো দেখতে পেল না।

টুনু পড়ার টেবিলে ফিরে দু গালে দুটো হাত দিয়ে বসে রইল।

বাবর, জাহাঙ্গীর, হুমায়ুন যে যার কবরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। শের সাহ আর তার ঘোড়ার ডাক নিশ্চিহ্ন। এমন কি বীজগণিত, জ্যামিতি সব বেমালুম চাপা রইল বইয়ের স্তূপের মধ্যে।

নতুন চিন্তায় টুনুর মন আলোড়িত হতে লাগল।

আচমকা এই আলোর দীপ্তি। তার পাশে খর্বকায় লোকদের ইশারা। কি হতে পারে?

কোন শত্রুর গুপ্তচর এভাবে সংকেত করছে।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কথাটা মনে হল।

জানলার দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখল, অনেক দূরে আলোর ক্ষীণ বিন্দু জ্বলে উঠেই নিভে গেল।

বেশ কিছুদিন আগে শহরের সব কাগজে বের হয়েছিল। আনন্দবাজারে তো ছিলই।

উড়ন্ত চাকী, উড়ন্ত চাকী। দেশ বিদেশে নানা বয়সের লোক বিভিন্ন সময়ে এই উড়ন্ত চাকী দেখেছে।

পিরীচের মতন আকাশের একদিক থেকে বিদ্যুৎগতিতে আর এক দিকে ছুটে চলে গেল। পলকের মধ্যে অদৃশ্য।

দু একজন আবার বেশীও দেখেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় এক চাষী চাষ করতে করতে দেখল তার মাঠের মাঝখানে পাতলা নীল পোশাকপরা অদ্ভুতদর্শন একটি লোক এদিক ওদিক দেখছে। চাষীর দিকে নজর পড়তেই ছুটে একটা গাছের নীচে চলে গেল। আর তাকে দেখা গেল না।

ইরানে প্রায় একই ব্যাপার। একজন ক্লান্ত পথিক পথের ধারে বিশ্রাম করছিল, হঠাৎ দেখল, পাহাড়ের গা বেয়ে দুজন ছোট্ট মানুষ, লম্বায় দু ফিটের বেশী নয়, তর তর করে নেমে আসছে। কিছুটা নেমে তারা দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর ঝোপের পিছনে হারিয়ে গেল।

পথিক ছুটে তন্ন তন্ন করে ঝোপ অনুসন্ধান করল। কেউ নেই, শুধু ঝোপের সবুজ পাতাগুলো আগুনে ঝলসে যেন লালচে হয়ে গেছে।

পত্রিকাগুলো মন্তব্য করেছিল, খর্বকায় এই লোকগুলো নিঃসন্দেহে অন্য গ্রহের বাসিন্দা। আমরা যেমন অন্য গ্রহ সম্বন্ধে আগ্রহী, তারাও তাই। পৃথিবীতে নেমে এখানকার জল হাওয়া, মাটির অবস্থা, লোকের হালচাল নিরীক্ষণ করে।

কারো দেখা পেলেই অদৃশ্য বায়ুযানে মিলিয়ে যায়।

পত্রিকাগুলো এও লিখেছে।

এরা বোধহয় এসেছে মঙ্গল গ্রহ থেকে, কারণ একমাত্র মঙ্গলগ্রহে এ পর্যন্ত জলের চিহ্ন দেখা গেছে। জল আছে বলেই, জীবন থাকা সম্ভব।

টুনু ঠিক করে ফেলল, আজ সে যাদের মাথা নাড়তে দেখেছে তারা নির্ঘাৎ মঙ্গল গ্রহ থেকে ঘুরন্ত এই গ্রামের ওপর নেমেছে। তারা কল্পনাও করতে পারেনি, এই পৃথিবীর এক কিশোর তাদের হালচালের ওপর নজর রেখেছে।

টুনু মতলব করল, দিনে যতটা সম্ভব পড়ে নেবে, আর রাত্রে এই মঙ্গলগ্রহের এই প্রাণীগুলোর ওপর

নজর রাখবে। ওই আলোটা আর কিছু নয় জ্বলন্ত হেলিকপ্টার জাতীয় কিছু। অন্ধকার কক্ষপথে পথ দেখানোরও কাজ করে।

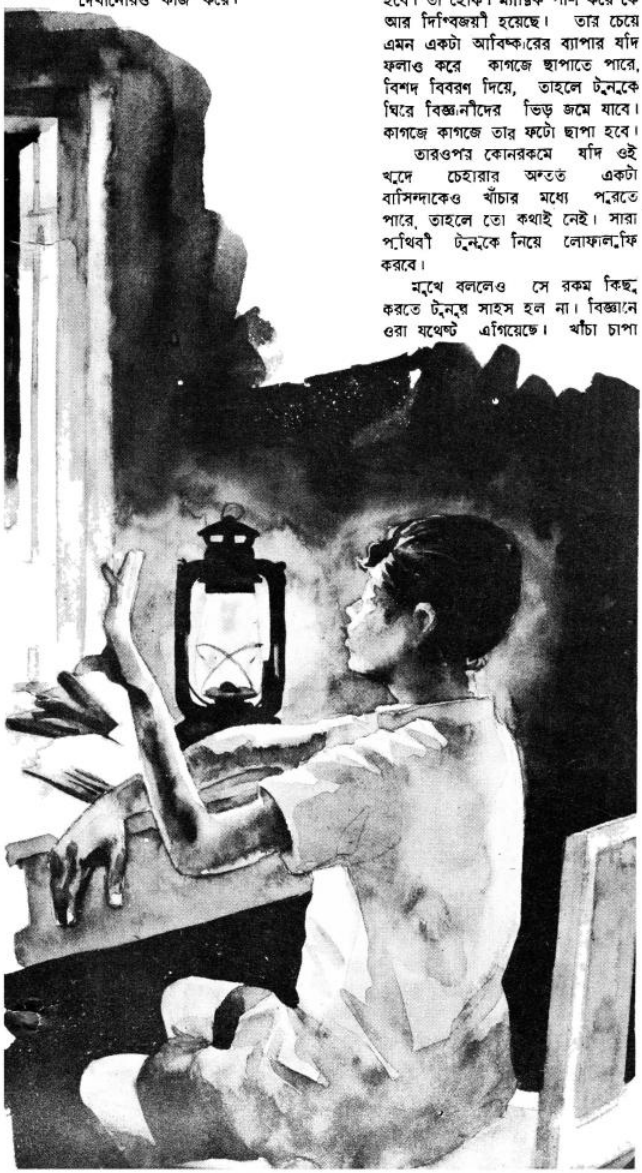

আনন্দে টুনুর নাচতে ইচ্ছা করল।

পড়াশোনার হয়তো একটু ক্ষতি হবে। তা হোক। ম্যাট্রিক পাশ করে কে আর দিগ্বিজয়ী হয়েছে। তার চেয়ে এমন একটা আবিষ্কারের ব্যাপার যদি ফলাও করে কাগজে ছাপাতে পারে, বিশদ বিবরণ দিয়ে, তাহলে টুনুকে ঘিরে বিজ্ঞানীদের ভিড় জমে যাবে। কাগজে কাগজে তার ফটো ছাপা হবে।

তারওপর কোনরকমে যদি ওই খুদে চেহারার অন্তত একটা বাসিন্দাকেও খাঁচার মধ্যে পুরতে পারে, তাহলে তো কথাই নেই। সারা পৃথিবী টুনুকে নিয়ে লোফালুফি করবে।

মুখে বললেও সে রকম কিছু করতে টুনুর সাহস হল না। বিজ্ঞানে ওরা যথেষ্ট এগিয়েছে। খাঁচা চাপা দিতে গেলে এমন অস্ত্র টুনুর গায়ে ছুঁইয়ে দেবে যে টুনু কালো তরল পদার্থ হয়ে যাবে।

পরের দিন মামি দেখে বলবে, ওমা, এখানে গুড় ফেলল কে? বলেই পাতা দিয়ে মুছে নেবে।

সারাটা রাত টুনুর ঘুম হল না। এপাশ আর ওপাশ করল।

মাঝে মাঝে উঠে জানলা দিয়ে দেখল। কোথাও একটু আলো নেই।

ভোরে উঠেই টুনু স্থির করল, এসব গোপন কথা কাউকে বলবে না। আরও কিছু দিন মঙ্গলগ্রহের বাসিন্দাদের আনাগোনা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে, তবে সব কিছু ফাঁস করবে।

কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে টুনু ছটফট করতে লাগল।

কাউকে কথাটা বলতে না পারলে তার পেট ফেটে যাবার দাখিল।

এতবড় একটা কথা কাকেই বা বলবে!

মামা ভোরবেলা থেকে বাড়িছাড়া। মামির বেশীর ভাগ সময় কাটে রান্নাঘরে। বাকি থাকে বিন্দু।

টুনু ঠিক করল কথাটা বিন্দুকে বলবে।

বিন্দু যখন ঘর মুছতে এল, তখন টুনু বলল, বিন্দুদি একটা কথা আছে।

আমার সঙ্গে? কি কথা?

জান তো, আমাদের পৃথিবী যেমন গ্রহ, তেমনই আশে পাশে আরও অনেক গ্রহ আছে। মঙ্গল, শুক্র, হার্সেল, বৃহস্পতি।

বাধা দিয়ে বিন্দু বলল, ওমা, তা আবার জানি না। গ্রহ কম আছে নাকি! মা তো কথায় কথায় বলে, কোন গ্রহ আমি সামলাব! বাবা বলে, গ্রহের ফের চলেছে।

টুনু তর্ক করল না। তর্ক করলে আসল কথা বলা হবে না।

তাই সে বলল, ওই সব গ্রহে প্রাণী আছে। মানে আমাদের মতন প্রাণী।

এবার বিন্দু মেঝের ওপর বসে পড়ল।

উৎসাহিত হয়ে টুনু বলতে লাগল।

প্রাণী আছে বটে কিন্তু দেখতে আমাদের মতন নয়। ছোট ছোট চেহারা। মাথায় লোহার মতন শক্ত শক্ত চুল। তুমি শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবে কোন একটা গ্রহ থেকে অদ্ভুত চেহারার সব প্রাণী তোমাদের গাঁয়ে নেমেছে।

আমাদের গাঁয়ে? বিন্দুর দুটো চোখ বিস্ফারিত।

হ্যাঁ বিন্দুদি, শুধু তোমাদের গাঁয়ে নয়, এই পিছনের মাঠে। আমি কাল রাত্রে স্বচক্ষে দেখেছি। একবার নয়, বার দুয়েক। জ্বলন্ত একটা প্লেন এসে নামল। তারপর খুদে খুদে সব লোকেরা বের হল সেটা থেকে।

বিন্দু উঠে দাঁড়াল। তুমি নিজের চোখে দেখেছ?

আলবত। তুমি রাত্রে যদি এ ঘরে আস তোমাকেও দেখাব। এই জানলা দিয়ে স্পষ্ট দেখা যায়।

টুনুর কথা শেষ হবার আগেই বিন্দু ছুটে বেরিয়ে গেল।

টুনু গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসল।

এত বড় একটা আবিষ্কারের ব্যাপার পৃথিবীর লোককে কি করে সে জানাবে। এমন ব্যাপার হবে জানলে, সে নিজের ক্যামেরাটা নিয়ে আসত। কয়েকটা ফটো তুলে নিতে পারলে কেউ অবিশ্বাস করতে পারত না।

টুনু যখন চিন্তায় বিভোর, তখন আচমকা পিছন থেকে কে তাকে জাপটে ধরল।

প্রথমে টুনু ভাবল অন্য গ্রহের বাসিন্দারাই কেউ হবে, কিন্তু একটু পরেই বিন্দুর চিৎকারে তার সম্বিত ফিরে এল।

ভাল করে ধরে থাক মা, আমি তেলটা মাথায় ঢেলে দিই।

তারপরই মামির গলা, আহা, রাতদিন পড়ে পড়ে বাছার আমার মাথাটাই বিগড়ে গেছে গো, নইলে এরকম আবোল তাবোল কথা বলে! মধ্যমনারায়ণ তেলে পাগলেরও মাথা ঠাণ্ডা হয়। দে বিন্দু, একটু বেশী করে ঢেলে দে।

হড় হড় করে টুনুর মাথায় তেলের স্রোত নামল। গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসবার যোগাড়। বহু কষ্টে সে বমি সামলাল।

টুনু অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে ছাড়াতে পারল না। মামির বজ্রবন্ধন। বিন্দুও রীতিমত জোরে চেপে ধরেছে।

নিরুপায় হয়ে টুনু বসে রইল।

সেই তেল কপাল বেয়ে গালের ওপর। সেখান থেকে টপটপ করে শরীরে। রাগে, দুঃখে, অপমানে টুনুর দু চোখ জলে ভরে গেল।

টুনু একবার ভাবল, সারাদিন কিছু খাবে না। চুপচাপ এইভাবে বসে থাকবে।

তারপর তার মনে পড়ে গেল বিজ্ঞানের সাধনায় অনেক বাধা। যুগে যুগে দেশে দেশে বহু বিজ্ঞান সাধককে নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে, মৃত্যুও বরণ করতে হয়েছে।

আজ যারা এরকম ব্যবহার করছে, ভাবছে, টুনুর মাথায় গোলমাল হয়েছে, তারাই একদিন ফুলের মালা নিয়ে টুনুর কাছে এসে দাঁড়াবে।

অনেকক্ষণ ধরে টুনু সাবান ঘসে ঘসে স্নান করল। সাবান ফুরিয়ে গেল, কিন্তু গন্ধ বিশেষ কমল না। গম্ভীর হয়ে খাওয়া দাওয়া সারল। কারও সঙ্গে বিশেষ কথা বলল না। তবে বুঝতে পারল, বিন্দুদি আর মামি তাকে কেমন সন্দেহের চোখে লক্ষ্য করে যাচ্ছে।

সারা দুপুর টুনু বসে বসে পড়ল। এ ছাড়া উপায় নেই। আজ সারা রাত জেগে বসে থাকবে। অন্য গ্রহের বাসিন্দারা যদি নামে, তবে তাদের হালচাল নোট করবে।

রাতের খাওয়া তাড়াতাড়ি সেরে টুনু জানলার ধারে বসল। একটা বই দিয়ে হ্যারিকেনটা আড়াল করল, যাতে আলোর রেখা বাইরে কোথাও না পড়ে। কি জানি কাছাকাছি আলো দেখলে গ্রহের বাসিন্দারা সাবধান হয়ে যেতে পারে।

বরাত টুনুর।

একটু পরেই আলোর ঝলক দেখা গেল। সেই সঙ্গে খাড়াচুল বেঁটে চেহারার বাসিন্দাদের মাথা নাড়া।

টুনু উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল। আজকের আলো খুব তীব্র। একবার নিভেই দপ করে আবার জ্বলে উঠল।

এদৃশ্য টুনু কাকে ডেকে দেখাবে। ভাবল মামি কিংবা বিন্দুদিকে ডেকে আনবে। তারা নিজের চোখে দেখুক।

কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে মামার কাশির শব্দ কানে এল। খাওয়ার পর মামা দাওয়ায় বসে অনেকক্ষণ তামাক খায়।

চেঁচিয়ে মামাকে ডাকতে টুনুর সাহস হল না। কি জানি যদি গ্রহের বাসিন্দাদের কানে আওয়াজ যায়। তারা কোন রকম আলোর রশ্মি ফেলে টুনুকে ছাই করে দেয়।

তাই টুনু ঘর থেকে বেরিয়ে মামার পিছনে গিয়ে আস্তে আস্তে ডাকল, মামা, শিগগীর আসুন। দেরি করবেন না।

হুঁকো সরিয়ে মামা উঠে দাঁড়াল। কিরে সাপ নাকি?

টুনু কোন উত্তর না দিয়ে মামার হাত ধরে টেনে ঘরের মধ্যে নিয়ে এল। জানলার কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, বাইরে দেখুন।

মামা দেখল। জমাট অন্ধকার। মাঝে মাঝে শুধু জোনাকির জ্বলা-নেভা।

টুনু মনে মনে কপাল চাপড়াল। হায়রে মামাকে কিছুই দেখানো গেল না।

মামা জিজ্ঞাসা করল, কি দেখব কি বাইরে? শেয়াল টেয়াল দেখেছিস, না কি?

না, না, টুনু মাথা নাড়ল, তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না মামা। আমি স্পষ্ট দেখেছি, অন্য গ্রহ থেকে একটা জ্বলন্ত যান ওইখানে নামে আর বেঁটে বেঁটে খাড়াচুল বাসিন্দারা মাথা নেড়ে ইশারা করে।

অ্যাঁ? মামা অবাক হয়ে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে দূরে আবার আলোর দীপ্তি। খাড়াচুল বেঁটে লোকগুলো মাথা দোলায়।

ওই দেখ মামা, নিজের চোখে দেখ।

মামা দেখল। বারবার তিনবার আলো জ্বলে উঠল আর নিভল।

দেখা শেষ করে মামা হো হো করে হেসে উঠল। এত জোরে যে বিন্দু আর মামি ঘুম ছেড়ে উঠে টুনুর ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল।

মানে, তুমি একে শহরের ছেলে তার ওপর বিজ্ঞানের ছাত্র নও, তাই আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারনি। ওদিকটা জলা। আমরা বলি ভৈরবের জলা। ওইসব জলা জায়গায় ওই রকম গ্যাস দেখা যায়। মিথেন গ্যাস। তার সঙ্গে ফসফিন যোগ হলেই ওই রকম জ্বলে ওঠে।

টুনুর মুখটা কালো হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পরে সে আমতা আমতা করে বলল, কিন্তু ওই বেঁটে খাড়া চুল মানুষগুলো?

মামা আবার হাসিতে ফেটে পড়ল।

ওগুলো মোটেই ভিন্ন গ্রহের বাসিন্দা নয়। তালগাছের চারা। এক সঙ্গে গোটা চার পাঁচ। আলোয়ার আলোয় ওরকম দেখাচ্ছে, আর বাতাসে পাতাগুলো নড়ছে বলে, তুমি ভাবছ, মাথা নেড়ে ইশারা করছে। কাল সকালে তুমি নিজে গিয়ে দেখে এস। তা হলেই আমার কথা সত্যি না মিথ্যা বুঝতে পারবে।

এবার শুধু মামা নয়, মামার সঙ্গে মামি আর বিন্দুও খিল খিল করে হেসে উঠল।

ছবি এঁকেছেন ॥ মদন সরকার

রাজায় রাজায়/কি করে দাবা খেলতে হয়

গতবার বোড়ে সম্পর্কে কথা শেষ হয়নি। বোড়ে সোজাসুজি যায় বটে, কিন্তু শত্রুপক্ষের ঘুঁটি সোজাসুজি মারতে পারেনা। মারতে হলে কোনাকুনি মারতে হয়। বোড়ে কেবল এগিয়েই চলতে পারে।

গজ যায় কোনাকুনি। প্রত্যেক দলে দুটো করে গজ থাকে। সাদার দুটো গজ, কালোর দুটো। সাদার দুটো গজ আবার দুরকম, একটা কেবল সাদা ঘরেই যেতে পারে, আর অন্যটা কেবল কালো ঘরেই যায়। কালোর পক্ষের দুটো গজও তাই।

গজ যে কোন দিকে কোনাকুনি যতগুলি ইচ্ছে ঘর যেতে পারে বা বিপক্ষের ঘুঁটিকে এভাবে মারতে পারে।

নৌকো যায় পাশাপাশি। গজ যেমন যায় কোনাকুনি, তেমনি নৌকো আবার সোজাসুজি বা পাশাপাশি যে

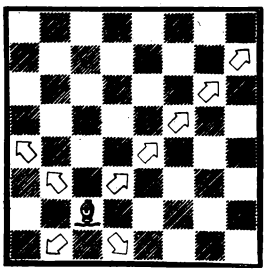

গজ চলে কোনাকুনি যতদূর ফাঁকা পাওয়া যায়।

কালোর দিক

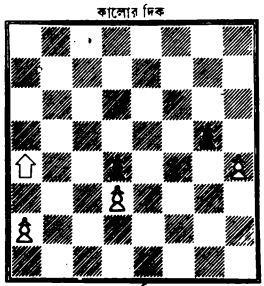

সাদার দিক

বোড়ে যায় সামনের দিকে—এক ঘর করে, তবে প্রত্যেকটি বোড়ের প্রথম চাল এক ঘর বা দু ঘর হতে পারে।

মাঝখানে দেখানো হয়েছে কালোর আর সাদার বোড়ে সামনাসামনি এসে থেমে গেছে। এখন এ দুটো বোড়ের কোনটাই চলতেও পারে না একে অন্যকে মারতেও পারে না।

ডানদিকে দেখানো হয়েছে একটি সাদা বোড়ে এবং একটি কালো বোড়ে। এদের যে কোন বোড়ে যে কোনটিকে মারতে পারে।

কোন ঘর পর্যন্ত যেতে পারে যদি নিজেরই ঘুঁটি পথ না আটকে দেয়। ঘোড়া ছাড়া সমস্ত ঘুঁটি সম্পর্কেই একথা বলা যায়।

মন্ত্রীর চাল। মন্ত্রীর শক্তি সবচেয়ে বেশি। মন্ত্রী গজের মত কোনাকুনি যতদূর ইচ্ছে যেতে পারে, আবার নৌকোর মত পাশাপাশি এর যাওয়ার অবাধ স্বাধীনতা। গজ যদি ছকের মাঝখানে থাকে তাহলে সে চারদিকে যেতে পারে কোনাকুনি, আর নৌকো যেতে পারে চারদিকে পাশাপাশি, কিন্তু মন্ত্রী যদি ছকের মাঝামাঝি কোথাও থাকে তাহলে সে যেতে পারে আট দিকে। তাই ঘুঁটিদের মধ্যে মন্ত্রীর দাম সবচেয়ে বেশি। কিন্তু কত বেশি?

যদি বোড়ের দাম ধরা হয়, ১, তাহলে গজ এবং ঘোড়ার দাম ৩, নৌকোর দাম ৫, মন্ত্রীর দাম ৯।

আর রাজা? রাজার কোন দাম নেই—রাজা অমূল্য। রাজার তা বলে কিন্তু শক্তি নেই তা বলা যায়না। রাজাও চলতে পারে, কিন্তু ধীরে সুস্থে। রাজা যে কোন দিকে মাত্র এক ঘর চলতে পারে। অর্থাৎ, ছকের মাঝামাঝি কোথাও রাজা থাকলে রাজা তার আশে পাশের ৮টি ঘরের যে কোন একটিতে যেতে পারে।

—দিগ্‌দর্শক

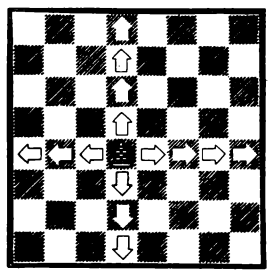

নৌকো চলে পাশাপাশি উপর নিচ যতদূর ফাঁকা পাওয়া যায়।

কাগজের নাম ফুলস্ক্যাপ হল কেন?

তোমরা অনেকেই 'ফুলস্ক্যাপ' কাগজে লেখ। কিন্তু 'ফুলস্ক্যাপ' নামটা কোথা থেকে এলো তা কেউ জান? এই নিয়ে অনেক মত চালু আছে। এক তো হল, কাগজ যারা তৈরী করেছিল, তারা ফুলস ক্যাপ মানে বোকাদের টুপি আর ঘণ্টা কাগজে জলছাপ হিসেবে ব্যবহার করেছিল। সে অনেককাল আগেকার কথা। সেই থেকে হল ফুলস্ক্যাপ কাগজ। কিন্তু এ-ছাড়াও আরো গল্প আছে। প্রথম চার্লসের সময় থেকে সবরকম সরকারী কাজে যে-রাজকীয় ছাপ ব্যবহার করা হত, অলিভার ক্রমওয়েল তার বদলে ওই বোকার টুপি আর ঘণ্টার জলছাপ কাগজওয়ালাদের ব্যবহার করতে বলেছিলেন।ক্রমওয়েল তাঁর যাবতীয় চিঠিপত্রে, কাগজে মুক্তি ও স্বাধীনতার টিকিট ব্যবহার করতেন। রাজতন্ত্রে স্টুয়ার্ট বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর দ্বিতীয় চার্লসের কাছে সেই সব চিঠি, কাগজপত্র কিছু কিছু আনা হয়।

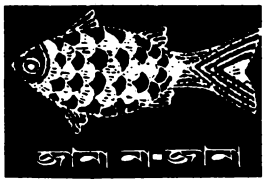

তিনি খুঁটিয়ে দেখেটেখে নাকি বলেছিলেন : 'এ সব নিয়ে যাও এখান থেকে। এই 'গাধার টুপি'তে (ফুলস ক্যাপ) আমার কোন দরকার নেই।'

ইস্কুলে দুষ্টুমি করলে কিংবা পড়া না পারলে ছেলেদের গাধার টুপি পরিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল এককালে।

রাজা হওয়ার

আগে যা ঘটেছে

বোম্বাগড় রাজ্যের মহারাজা কন্দর্পনারায়ণ একদিন তাঁর রাজপুরোহিত, মন্ত্রী, কোটাল, সেনাপতি সকলকে তাঁর দরবারে ডাকলেন। তাঁর দুই ছেলে কীর্তিনারায়ণ আর কান্তিনারায়ণ, তাঁদেরও ডাকলেন। ডেকে জানালেন যে, তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়েস হয়েছে। সুতরাং রাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী তিনি বানপ্রস্থে যাবেন। যাবার আগে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দুই ছেলেকে আধাআধি ভাগ করে দিয়ে যেতে চান। কিন্তু মুশকিল হয়েছে একটা মরকতমণি নিয়ে। যেহেতু মণিটাকে কেটে দু'ভাগে ভাগ করা যায় না তাই তিনি সেটা দুই ছেলের কাউকেই দিতে চান না। দিতে চান এমন একটা লোককে যে সর্বশ্রেষ্ঠ নির্বোধ বলে বিবেচিত হবে। তিনি প্রস্তাব দিলেন যে, তাঁর দুই ছেলের মধ্যে যে সর্বশ্রেষ্ঠ নির্বোধ লোককে খুঁজে বার করতে পারবে তাকেই তিনি সিংহাসনে বসবার উপযুক্ত বলে স্থির করবেন। প্রস্তাবটা শুনে সবাই প্রথমে অবাক হয়ে গেলেন। এর পর মহারাজা বানপ্রস্থে চলে গেলেন। মন্ত্রী ভূপনারায়ণ সিং মহারাজার অবর্তমানে তাঁর মুকুট শূন্য-সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। কিন্তু মহারাজার দুই ছেলের মধ্যে তখন মনে-মনে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। দু'জনের মধ্যে কে সবচেয়ে বোকা লোক আবিষ্কার করতে পারবে তারই প্রতিযোগিতা। যার আবিষ্কার করা বোকা লোক দু'জনের বোকা লোকের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে ঠিক হবে সেই ছেলেকেই মহারাজা সিংহাসনে বসবার অধিকার দেবেন।

কিন্তু ছ'মাস মাত্র সময়। এই ছ'মাসের মধ্যেই বোকা লোক বাছাই শেষ করতে হবে। সুতরাং কীর্তিনারায়ণ আর কান্তিনারায়ণ দু'জনেই তখন ব্যস্ত হয়ে উঠলো। দু'জনেই হুকুম করলো মন্ত্রীমশাইকে—তাড়াতাড়ি বোকা লোক খুঁজে বার করে দিন। মন্ত্রীমশাই হুকুম করলেন কোটালকে। কোটাল হুকুম করলেন সেনাপতিকে। কিন্তু সারা রাজ্য খুঁজেও কোথাও বোকা লোক পাওয়া গেল না।

আসলে এই অদ্ভুত হুকুমটি ছিল মহারাজার নয়, ছিল বোম্বাগড়ের গৃহদেবতা মা বিশালাক্ষী দেবীর। তিনিই স্বপ্নে মহারাজাকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এক মহারাজা ছাড়া আর কেউই জানতো না সেই স্বপ্নের কথা। কিন্তু যখন আর কিছুতেই কোথাও বোকা লোক পাওয়া গেল না, তখন একদিন মন্ত্রীমশাই ঘোড়া নিয়ে ছুটলেন মহারাজার কাছে। গিয়ে সমস্যার কথাটা মহারাজাকে খুলে বললেন।

মহারাজা কন্দর্পনারায়ণ শান্তির আশায় বনে এসেছিলেন। ভেবেছিলেন রাজ্য-শাসনের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে তিনি যে-ক'দিন বাঁচবেন মা বিশালাক্ষী দেবীর পুজো করে দিন কাটাবেন। তারপর মন্ত্রী ভূপনারায়ণ আছে। যতদিন না দুই ছেলের মধ্যে কেউ রাজা হয় ততদিন সে-ই সমস্ত ভালোভাবে চালাবে।

কিন্তু এখানে এসেও সেই তাঁর কাছেই পরামর্শ করতে এসেছে মন্ত্রী?

বললেন—আমিই যদি পরামর্শ দেব তো তুমি কী করতে আছো ভূপনারায়ণ? এ তো তোমারই কাজ। আমাকে আবার ওর মধ্যে জড়াচ্ছো কেন?

মন্ত্রী বললে—আর কোনও উপায় না পেয়েই আপনার কাছে এসেছি। আমি যে আপনার কাছে এসেছি এ কেউই জানে না। কোটাল, সেনাপতি, রাজ-পুরোহিত, রাজপুত্তরা—তাদের কাউকেই বলিনি। আমার মাথায় আর বুদ্ধি গজাচ্ছেই না। ওদিকে রাজপুত্তরাও অধীর হয়ে উঠেছেন।

রাজা মনে-মনে বললেন—তা তো অধীর হবেই। ক্ষমতার লোভ বড় লোভ। সম্পত্তির লোভের চেয়েও ক্ষমতার লোভ বড়। সম্পত্তি মানুষকে অহঙ্কারী করে। কিন্তু ক্ষমতা লাভের পর মানুষ চরিত্রহীন হয়। যার চরিত্র নেই সে-মানুষ রাজা হওয়ার অযোগ্য।

মুখে বললেন—কিন্তু মন্ত্রী, আমার নির্দেশ তো অমান্য করা চলবে না। ও নির্দেশ পালন করতেই হবে। যেখান থেকে হোক যেমন করে হোক দু'জনকে দু'জন বোকা লোক খুঁজে বার করে আনতেই হবে—।

—কিন্তু মহারাজ, বোকা লোক যে কেউই নেই!

মহারাজা বললেন—তা বলে তুমি কি বলতে চাও পৃথিবীর সমস্ত লোক রাতারাতি বুদ্ধিমান হয়ে গেছে? কেউ বোকা নেই কোথাও?

—আজ্ঞে, তা কী করে বলি! কেউ যদি স্বীকার না করে সে বোকা তাহলে আমি কী করতে পারি? চালাক পাওয়া যাচ্ছে, ভণ্ড পাওয়া যাচ্ছে, সাধু পাওয়া যাচ্ছে, চোর পাওয়া যাচ্ছে, ডাকাত পাওয়া যাচ্ছে, মিথ্যেবাদী পাওয়া যাচ্ছে, সব রকম লোক বোম্বাগড়ে পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে বোকা লোক পাওয়া নিয়ে।

মহারাজা বললেন—এটা অসম্ভব মন্ত্রী, ভগবান নানান্ রকম বিচিত্র প্রাণী দিয়ে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এখানে বনে নানারকম জন্তু-জানোয়ার আছে। এখানে সাপ বাঘ ভাল্লুক যেমন আছে, তেমনি পাখী, ফুল, ময়ূর, হাঁসও আছে। আবার দেখ ফুল যেমন আছে, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি আবার তার কাঁটাও আছে। আলো আছে অন্ধকারও আছে ঠিক তার পাশাপাশি। এ এক অদ্ভুত সৃষ্টি বিধাতা-পুরুষের। মানুষের মধ্যে তিনি চতুর লোকের সৃষ্টি করেছেন আর বোকা লোকের সৃষ্টি করতে ভুলে গেছেন, এ হতে পারে না। তোমরা বোকা লোক খুঁজে পাচ্ছো না তাই বলো। সে তোমাদের দোষ। তা এখনও তো পাঁচ মাস সময় আছে, আরো চেষ্টা করে দেখো, নিশ্চয়ই বোকা খুঁজে পাবে। বোম্বাগড়ে খুঁজে না পাও বোম্বাগড়ের বাইরে খোঁজো। বোম্বাগড় ছাড়া কি পৃথিবীতে আর দেশ নেই? সে দেশেও তো মানুষ আছে। সেখানে নিশ্চয়ই বোকা লোক খুঁজে পাবে। মোটকথা আমি একবার যে-হুকুম দিয়েছি তার আর নড়-চড় নেই। যাও—

মন্ত্রী অগত্যা চলে গেলেন। এ যে তাঁর কী বিপদ তা

ঝকমারি

বিমল মিত্র

উপন্যাস

পৃথিবীর আর কোনও মন্ত্রী বুঝবে না। রাজা হওয়ার ঝক্‌মারি তো আছেই, কিন্তু মন্ত্রী হওয়ারও যে কী ঝকমারি তা কি তিনি এর আগে এমনভাবে বুঝেছিলেন?

সেই এক মাসের মধ্যে বোম্বাগড়ের সমস্ত অঞ্চলে খবরটা রটে গেছে যে কোনও বোকা লোক কোথাও পাওয়া যায়নি। পাড়ায় পাড়ায় লোকের মুখে-মুখে কথাটা আলোচনা হতে আরম্ভ হয়েছে।

কেউ বলছে—শুনেছ হে, শুনছি নাকি মন্ত্রীমশাই বোকা লোক খুঁজে পায়নি?

একজন বললে—হ্যাঁ শুনেছি। তা সে তো আমরা আগেই জানতুম খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ তো মহারাজারই দোষ! বোকা লোক কখনও বোম্বাগড়ে খুঁজে পাওয়া যায়?

পাশের একজন লোক জিজ্ঞেস করলে—তাহলে কী হবে? বোকা লোক যদি শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া না যায় তাহলে কে রাজা হবে? বড় রাজপুত্র না ছোট?

ব্যাপারটা ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠলো। আর পাঁচ মাস মাত্র বাকি। এই পাঁচ মাস পরেই যাহোক একটা হেস্ত-নেস্ত হয়ে যাবেই। তার আগে পর্যন্ত সমস্ত জায়গায় সব লোকের মুখে শুধু ওই একই বিষয়ের আলোচনা। যে কেউ রাজধানী থেকে ফিরে আসে তাকেই লোকে ছেঁকে ধরে। জিজ্ঞেস করে—কী হে, নতুন খবর কিছু শুনলে?

সে বলে—না—

সবাই অবাক হয়ে যায়। বলে—সে কী হে! রাজ-ধানীতে গেলে আর আসল খবরটার কিছুই শুনে এলে না?

কিন্তু আসল খবর মন্ত্রী ভূপনারায়ণ সিং-ই কি জানেন যে বাইরের লোক কিছু শুনবে? মহারাজা বনে চলে যাবার পর থেকে আর তাঁর মনে শান্তি নেই। এমন যে হবে তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। এত সোজা জিনিস যে এত ঘোরালো হয়ে উঠবে তাও তাঁর জানা ছিল না।

কিন্তু মহারাজার সঙ্গে দেখা করে আসার পর একটা নতুন জিনিস মাথায় ঢুকলো। সত্যিই তো, শুধু বোম্বাগড় কেন, বোম্বাগড়ের বাইরেও তো দেশ আছে। সে-সব দেশেও তো মানুষ আছে। সে-মানুষদের মধ্যেও বোকা লোক খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। এমন তো কোনও কথা নেই যে শুধু বোম্বাগড় থেকেই বোকা লোক খুঁজে বার করতে হবে। বোম্বাগড়ের বাইরে বিশাল পৃথিবী পড়ে আছে। কাছেই রয়েছে জম্বুদ্বীপ। জম্বুদ্বীপে আরো অনেক লোক আছে। জম্বুদ্বীপ মস্ত বড় দেশ। সেখানে গেলে নিশ্চয়ই বোকা লোক পাওয়া যাবে।

কীর্তিনারায়ণ সেদিন আসতেই মন্ত্রীমশাই কথাটা পাড়লেন।

বললেন—তুমি এত মুষড়ে পড়ছো কেন বাবাজী? এখনও তো পাঁচ মাস সময় রয়েছে হাতে। তারপরে বোম্বাগড়ে বোকা লোক না পাওয়া যায়, বোম্বাগড়ের বাইরেও তো অনেক দেশ আছে—

—বোম্বাগড়ের বাইরে?

মন্ত্রীমশাই বললেন—হ্যাঁ, বোম্বাগড়ের বাইরে কি আর দেশ নেই? কত বড় বড় দেশ রয়েছে। কত মানুষ সেখানে। এই ধরো না, আমাদের বোম্বাগড় ছাড়িয়ে জাহাজে চড়ে একটু দূরে গেলেই সিংহল। তার পাশেই জম্বুদ্বীপ। জম্বুদ্বীপ বিশাল দেশ। সেখানে গেলে তুমি যত বোকা লোক চাইবে তত পাবে। তুমি অত ভাবছো কেন?

কীর্তিনারায়ণ জিজ্ঞেস করলে—সেখানে যেতে কত-দিন লাগবে?

—যেতে কত আর সময় লাগবে। সাত দিনের মধ্যেই তুমি সেখানে পৌঁছে যেতে পারবে।

কীর্তি বললে—তাহলে আমার যাবার ব্যবস্থা করে দিন। জাহাজ তৈরি হলেই আমি রওনা হবো। আমার সঙ্গে শুধু দুচার জন লোক-লস্কর দিন। কিছু মোহর, আর কিছু চাল-ডাল—

মন্ত্রী বললেন—সে-জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। তোমার যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে তোমার ভাইএরও যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে—

শেষ পর্যন্ত সেই ব্যবস্থাই ঠিক হলো। কীর্তি-নারায়ণের জন্যে একটা জাহাজ। আর কান্তিনারায়ণের জন্যে আর একটা জাহাজ।

জাহাজ বোম্বাগড়ের মহারাজার ছিলই। অনেকগুলো জাহাজ ছিল। সবই সে-কালের পালতোলা জাহাজ। বোম্বাগড়ের চারদিকেই সমুদ্র। তখনকার দিনে এদেশ থেকে ওদেশে যাবার বেশি দরকার হতো না। নিজের নিজের দেশের দরকারগুলো নিজেদের দেশের ভেতরেই মিটে যেত। যুদ্ধও হতো না অন্য দেশের রাজার সঙ্গে যে একগাদা সৈন্য-সামন্ত বা নৌ-বাহিনী রাখতে হবে। জাহাজ সাধারণতঃ রাখতে হতো বাণিজ্য করবার জন্যে। দেশের জিনিস অন্য দেশে বিক্রি করলে খুব লাভ হয়। এই লাভের ব্যবসা যারা করতো তাদেরও নৌকো ছিল, জাহাজ ছিল। মহারাজাকে তার জন্যে তারা কর দিত।

রাজপুরোহিত দারুকেশ্বর চক্রবর্তী পঞ্জিকা দেখে একটা দিন মুহূর্ত স্থির করে দিলেন। রাজপুত্ররাও তৈরি ছিল। রাজকোষ থেকে স্বর্ণমুদ্রা, চাল-ডাল-ঘি-তেল-মশলা সব কিছুই তৈরি। সাত দিনের রাস্তা। সাত দিন ধরে দুটি জাহাজের লোকজন খাবে, থাকবে। তাদের সমস্ত কিছু সাজ-সরঞ্জাম জোগাড় করে দিলে মন্ত্রীমশাই।

রাস্তায় ঝড়-বৃষ্টি হয়ে বিপদ-আপদ ঘটতে পারে তার জন্যেও সব কিছুর ব্যবস্থা করে দিলেন। সাত দিনের বদলে জম্বুদ্বীপে পৌঁছোতে হয়ত একমাস সময়ও লাগতে পারে। কিছুই বলা যায় না।

মন্ত্রীমশাই দুজনকেই উপদেশ দিলেন—খুব সাবধানে থাকবে তোমরা বাবাজী, বিদেশ-বিভুঁই জায়গা। যদি কোনও বিপদ-আপদ হয় তোমাদের তার জন্যে তোমাদের দুজনের সঙ্গেই দুটি পায়রা দিলাম। এদের পায়ে যদি কোনও চিঠি বেঁধে দাও তো যেখান থেকেই তোমরা এদের আকাশে উড়িয়ে দেবে এরা ঠিক বোম্বাগড় চিনে এখানে এসে পৌঁছতে পারবে।

খাঁচায় পোরা দুটি পায়রাকেও জাহাজে ওঠানো হলো।

রাজপুরোহিত আশীর্বাদ করলেন দুই রাজপুত্রকে। রাজপুত্ররাও রাজপুরোহিতের পা ছুঁয়ে মাথায় ঠেকালো।

বোম্বাগড়ের জাহাজ-ঘাটাতে রাজধানীর অনেক লোক রাজপুত্রদের সমুদ্র-যাত্রা দেখতে এসেছিল। সকলের চোখেই জল। মহারাজা নেই, মহারানীও নেই। ছিল রাজপুত্ররা। তারাও দেশান্তরী হলো। আর কবে যে তারা ফিরবে তারও কোনও ভরসা নেই।

দুটো জাহাজের পাটাতনের ওপর রসদ উঠেছে। মন্ত্রীমশাই নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করছেন। কোথাও যেন কোনও ত্রুটি না থাকে। সমুদ্র-যাত্রায় যেন রাজপুত্রদের কোনও অসুবিধে বা কষ্ট না হয়। জম্বুদ্বীপে যাত্রা অনেক দূরের যাত্রা। সে-যাত্রা শুভ হোক, নিরাপদ হোক। সকলের এইই প্রার্থনা।

মন্ত্রীমশাইএর চোখ দুটোও আর তখন শুকনো নেই। জলে ছল-ছল করছিল। কিন্তু তিনিই বা কী করবেন! মহারাজার হুকুম। কেন যে তিনি এ-রকম হুকুম দিতে গেলেন কে জানে। কিন্তু একবার যখন তিনি হুকুম দিয়েছেন তখন তা মানতেই হবে।

রাজপুরোহিত দারুকেশ্বর চক্রবর্তী দেবী বিশালাক্ষীর পুজোর ফুল এনে রাজপুত্রদের মাথায় রেখে আশীর্বাদ করলেন। রাজপুত্ররা রাজপুরোহিতের পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকালো। তাদেরও দুর্ভাবনার শেষ নেই। কোথায় কোন বিদেশে গিয়ে কী-রকম অবস্থার মধ্যে তারা পড়বে তার কোনও ঠিক নেই। সেখানে গিয়ে বোকা লোক পাওয়া যাবে কিনা তারও কোনও স্থিরতা নেই। অথচ হাতে মাত্র পাঁচ মাস সময়। তার মধ্যে যাতায়াতেই তো প্রায় এক মাস সময় লেগে যাবে। তখন হাতে থাকবে মাত্র চার মাস। সেই চারমাসের মধ্যে সমস্ত জম্বুদ্বীপটা কি ঘোরা সম্ভব হবে? জম্বুদ্বীপের সব অঞ্চলের মানুষকে কি দেখা সম্ভব হবে?

আর যদি তা সম্ভবও হয় তাতেও তো কিছু নগদ লাভ হবে না। দুজনের মধ্যে কার ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে কে জানে! হয়ত কীর্তির আনা বোকা লোকই বাবার বিচারে জিতে যাবে। কীর্তিরও সেই ভয়। কত আশা করে তো সে যাচ্ছে। কিন্তু যদি কান্তিই জিতে যায়? কান্তির আনা বোকা লোকই যদি বাবার বিচারে বেশি বোকা বলে স্থির হয়। তখন?

জাহাজ দুটো একসঙ্গে ছাড়লো। পাল তুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে সোঁ-সোঁ করে ঢেউএর দোলায় দুলতে দুলতে মাঝ-দরিয়ার দিকে এগোতে লাগলো।

সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে বোম্বাগড়ের মানুষরা দেখলে কীর্তিনারায়ণ আর কান্তিনারায়ণ দুই রাজপুত্রের দুটো জাহাজ দুটো ভিন্ন পথ ধরলে। একটা চললো দক্ষিণ-মুখ বরাবর আর একটা চলতে লাগলো উত্তর-পুব কোনাকুনি। আর তারপর দূরে সমুদ্রের সীমানা পেরিয়ে দিগন্তে বিলীন হয়ে গেল।

জম্বুদ্বীপ বিশাল এক জনপদ। বোম্বাগড়ের চেয়ে একশো গুণ বিশাল। জম্বুদ্বীপে যেমন জনপদ আছে তেমনি আবার আছে অরণ্য, আর আছে বিরাট বিরাট পর্বত। তেমনি আবার নানা জাত, নানা ধর্ম, নানা ভাষা। বিধাতার বিচিত্র সৃষ্টি এই জম্বুদ্বীপ।

জম্বুদ্বীপের পুব দিকে সমুদ্রের ধারে সেদিন ভোর হয়-হয়। সমুদ্রের জলে শরীর ডুবিয়ে অনেক লোক পুব দিকের আকাশের পানে চেয়ে সূর্য-স্তব করছে। দিনের আলো অল্প-অল্প ফুটতে আরম্ভ করেছে। সমুদ্র-তীর অনেক লোকের আনাগোনায় তখন জমজমাট। কাছাকাছি একটা মন্দির। সেই মন্দিরের ভেতরে তখন কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে দেবতার পুজো চলছে। আর একটু পরেই লোক-জনের আনাগোনা আরো বাড়বে। কয়েকটা জেলেদের নৌকো রাত থাকতে সমুদ্রের জলে ভেসেছিল মাছ ধরবার জন্যে। তারা তখন তীরে ভেড়বার জন্যে তৈরী হচ্ছে এমন সময় দেখলে পাল তোলা একটা জাহাজ তাদের কাছাকাছি এসেছে। চেহারা দেখে বোঝা গেল ওটা বিদেশী কোনও জাহাজ।

জাহাজটা আরো কাছে আসতেই জাহাজ থেকে একজন মাঝি চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলে—এ কোন দেশ গো? এ দেশের নাম কী?

একজন জেলে উল্টে জিজ্ঞেস করলে—তোমরা কোন দেশের লোক?

—বোম্বাগড়।

—বোম্বাগড়? সে আবার কোন্ দেশ? সে কোথায়?

—বোম্বাগড়ের নাম শোনো নি? সে অনেক দূরে। এখান থেকে সাত দিনের পথ।

—তা বোম্বাগড় থেকে আমাদের দেশে আসছো কেন তোমরা? মাল বেচা-কেনা করতে বুঝি?

—না।

মাল বেচা করতে আসছে না শুনে অবাক হয়ে গেল জেলেরা। তবে কী করতে আসছো? অত দূর থেকে এত ঝামেলা সহ্য করে জম্বুদ্বীপে আসার কারণটা কী?

—এই দেশের নাম কি জম্বুদ্বীপ?

জেলেরা বললে—হ্যাঁগো, হ্যাঁ—

জাহাজের মাঝিরা বললে—আমরা জম্বুদ্বীপে বেড়াতে এসেছি, তোমাদের এখানে থাকবার ব্যবস্থা আছে?

—হ্যাঁ, মন্দিরে অতিথিশালা আছে, সেখানে অতিথি-দের জন্যে থাকবার-খাবার সব কিছু ব্যবস্থা আছে। তোমরা কতদিন থাকবে থাকো না, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না—

ততক্ষণে জাহাজটা তীরের কাছে এসে গেছে। জেলেদের নৌকোগুলোও তখন ঢেউএর আঘাত লেগে দুলে দুলে উঠছে। একবার উঁচুতে উঠছে, একবার নিচুতে নামছে। অনেক মাছ ধরেছে তারা। অনেক মেহনত

করেছে। এর পর ডাঙায় উঠে এই সব মাছ বেচে তারা অনেক পয়সা কামাবে।

জাহাজটা একটা জায়গায় এসে থামলো। থেমে নোঙর করে রাখলো। সেখান থেকে একটা ডিঙি নৌকোতে করে কান্তিনারায়ণ ডাঙায় এসে উঠলো। অনেক দিন পরে এই প্রথম মাটিতে পা দেওয়া। ডাঙায় নেমে কান্তিনারায়ণ মন্দিরটার দিকে এগিয়ে গেল।

রাস্তায় একটা লোককে দেখে কান্তি জিজ্ঞেস করলে—একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ভাই তোমাকে?

কান্তিনারায়ণের চেহারা দেখে বোধ হয় লোকটার একটু ভক্তি হলো। বললে—কী বলুন?

কান্তিনারায়ণ জিজ্ঞেস করলে—তোমাদের এখানে কোনও বোকা লোক পাওয়া যাবে?

—বোকা লোক? তার মানে?

কান্তি বললে—বোকা লোক বোঝ না? যার বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই সেই রকম লোককেই তো মানুষ বোকা বলে। সেই রকম একজন বোকা লোকের আমার দরকার। খুব জরুরী দরকার। আমি বোম্বাগড় থেকে বোকা লোক খুঁজতে তোমাদের জম্বুদ্বীপে এসেছি—

লোকটা কথা শুনে রেগে গেল।

বললে—কোথাকার আহাম্মক আপনি, বোম্বাগড় থেকে বোকা লোক খুঁজতে জম্বুদ্বীপে এসেছেন? আপনি কি ভেবেছেন জম্বুদ্বীপের লোক আপনাদের দেশের লোকের চেয়ে বোকা? এত বড় সাহস আপনার? যা বলেছেন বলেছেন, এ-কথা যেন জম্বুদ্বীপের আর কাউকে বলবেন না। বললে সে আপনাকে মেরে ফেলবে।

কান্তির পাশে পাশে তার সঙ্গে যাচ্ছিল মধু। মধু কান্তির ফাই-ফরমাস খাটবার জন্যে সঙ্গে এসেছে বোম্বাগড় থেকে। সে কান্তিনারায়ণের হাত ধরে সরিয়ে নিলে।

বললে—আপনি চুপ করুন ছোটবাবু, বেশি কথা বলবেন না, জম্বুদ্বীপের লোক সুবিধের নয়, চলে আসুন—

কান্তিনারায়ণ বললে—তুই আমাকে চুপ করতে বলবার কে রে বেটা? দেখছিস না লোকটার কেমন বোকা-বোকা চেহারা। ও নিশ্চয়ই একজন বোকা লোক। আমি বোকা লোক দেখলে চিনতে পারবো না ভেবেছিস? আমি কি বোকা?

মধু বললে—আপনি মিছিমিছি রাগ করছেন আমার ওপর ছোটবাবু, আমি তো আপনাকে ভালো কথা বলেছি। আপনি রাস্তার লোকের সঙ্গে অমন করে কথা বললে তারা আপনাকেই বরং বোকা ভাববে।

—আমাকেই বোকা ভাববে? বলছিস কী তুই?

—আজ্ঞে হ্যাঁ ছোটবাবু, চালাক লোকরা কখনও রাগ করে? রাগ করে বোকা লোকেরা।

কান্তিনারায়ণ রেগে গেল আবার। বললে—কী, আমাকে তুই জ্ঞান দিচ্ছিস? তোর এই বুদ্ধি? তুই তো দেখছি নিজেই একটা আস্ত বোকা। একটা আস্ত বোকা পাঁঠা। চল্, তোকেই বোম্বাগড়ে গিয়ে মনিটা দিয়ে দেব। তোর মত একটা অজ্ বোকা কাছে থাকতে আমি কিনা বোকা লোক খুঁজতে হন্যে হয়ে ঘুরছি—

মধু হাত-জোড় করে ক্ষমা চাইতে লাগলো। বলতে লাগলো—না ছোটবাবু, আমাকে মাফ করুন হুজুর, আমি আর কিছু বলবো না—আমি বোকা হতে চাই না—

—তাহলে কেন আমাকে তুই জ্ঞান দিতে গেলি? জানিস না যারা বোকা তারাই পরকে জ্ঞান দিতে যায়? আমি তোর ছোটবাবু, আর তুই কিনা আমাকেই জ্ঞান দিতে আসিস? তোর মতন বোকা লোক তো আমি আর দুটো দেখিনি—

—আজ্ঞে, এবারের মত আমাকে মাফ করুন, আমি আর কখখনো কাউকে জ্ঞান দেব না। আমাকে মাফ করুন আপনি—

ততক্ষণে মন্দিরের অতিথিশালার কাছে এসে গিয়েছিল দুজনে। অতিথিশালার কাছে আসতেই একজন জিজ্ঞেস করলে—কে আপনারা? কোথা থেকে আসছেন?

মধু উত্তর দিলে—আজ্ঞে ইনি হচ্ছেন আমার ছোটবাবু, আমরা এসেছি বোম্বাগড় থেকে। ইনি বোম্বাগড়ের ছোট-রাজপুত্র—কান্তিনারায়ণ—

(ক্রমশঃ)

ছবি এঁকেছেন ॥ সুধীর মৈত্র

টুকরো খবর

সোভিয়েত রাশিয়ার উত্তরে সাইবেরিয়া এক হিমশীতল দেশ। উত্তর-পশ্চিম সাইবেরিয়ার ভেরখোইআন্‌সক পৃথিবীর হিমতম অঞ্চল। সেখানে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের ৯৪° ফারেনহাইট নিচে।

সাইবেরিয়ার তুষারপৃষ্ঠের নিচে তেলের জন্যে খোঁড়াখুঁড়ি চলছিল অনেক দিন ধরে। অবশেষে ১৯৬০ সালে সাইবেরিয়ার তাইয়ুমেন প্রদেশে তেলের খোঁজ মিলল। এখন জানা যাচ্ছে সমগ্র সাইবেরিয়ার নিচে এত পেট্রোলিয়াম ও গ্যাস আছে, যে সাইবেরিয়া পেট্রোলিয়াম ও গ্যাসের ভূতল-সাগরে ভাসছে বললে বেশি বলা হবে না। সাইবেরিয়ায় আছে পৃথিবীর অর্ধেক সোনা, সবচেয়ে বেশি লোহা ও কয়লা, সবচেয়ে বড় বনভূমি। দক্ষিণ আফ্রিকার হীরের খনির তুল্য হীরের খনিও আছে সেখানে। পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা মনে করেন, আবহাওয়া ও ভূ-প্রকৃতির প্রবল বাধা জয় করে সমীক্ষা চালালে দেখা যাবে সাইবেরিয়ায় আরো অনেক রকম খনিজ সম্পদ আছে।

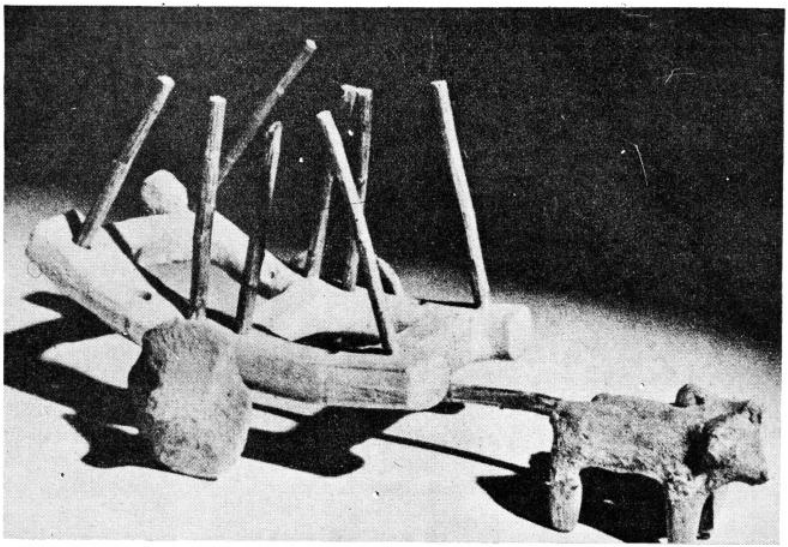

দেখেই বুঝতে পারছো এটা একটা গরুর গাড়ি। ছড়ি-হাতে একজন গাড়োয়ান বসিয়ে দিলেই সে গরুর লেজে মোচড় দেবে, আর ক্যাচ-ক্যাচ আওয়াজ তুলে চলতে শুরু করবে গাড়িটা। বেশ মজার খেলা, —তাই না?

বলতে পার এ গাড়ি নিয়ে কারা খেলতো? হাতে পেলে অবশ্য সবাই খেলতে রাজি। অনেক জায়গায় গাঁয়ের ছেলে-মেয়েরা এ ধরনের গাড়ি নিয়ে খেলেও থাকে। কিন্তু এ-গাড়ির সত্যিকারের খেলোয়াড়দের আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তারা সবাই বুড়ো হয়ে গেছে। দাদু দিদিমার চেয়েও বুড়ো। কমপক্ষে তাদের বয়স হয়ে গেছে চার হাজার বছর। হ্যাঁ, চার হাজার।

এই খেলনা-গাড়িটি পাওয়া গিয়েছিল তিপ্পান্ন বছর আগে, মহেঞ্জোদরো নামে একটা জায়গায় মাটি খুঁড়তে গিয়ে। জায়গাটা এখন পাকিস্তানে। সিন্ধু নদীর ধারে। এতদূর ছুটে যাওয়ার দরকার নেই। এ-গাড়ি দেখতে যদি চাও, একবার তবে কলকাতার জাদুঘরে এসে ঘুরে যাও।

মাটি খুঁড়ে মহেঞ্জোদরোতে অনেক কিছুই পাওয়া গেছে। আর তা-ই দেখে জানা গেছে হাজার হাজার বছর আগেও মানুষের বসতি ছিল সেখানে। শহর ছিল। ইঁটের বাড়ি ছিল। রাস্তাঘাট ছিল। নর্দমা ছিল। আর ছিল এই গাড়ি। বড়দের সত্যিকারের গরুর গাড়ি না থাকলে ছোটরা পাবে কী করে? আসল গাড়ি থাকলে তবেই না মাটি দিয়ে নকল গাড়ি গড়ার কথা আসে।

ছোট্ট এই গাড়িখানা থেকে কিন্তু অনেক খবরই জানা যেতে পারে। যেমন—মহেঞ্জোদরোয় ভাল রাস্তা ছিল। যেমন—গরুকে ওরা পোষ মানিয়েছিল। তা না হলে গরু গাড়ি টানতে রাজি হবে কেন? তাছাড়া বয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো জিনিসও নিশ্চয় ছিল ওদের। হয়তো এটা চাষীর বাড়ির গাড়ি গম বোঝাই করে চলেছে হাটের দিকে। কিংবা হয়তো কুমোড় পাড়ার গরুর গাড়ি, বোঝাই করে কলসি হাঁড়ি—! তবে আর সব খবরের চেয়েও সবচেয়ে জরুরী খবর কী জানো? এই গাড়ি বলছে—হাজার হাজার বছর আগেও আমাদের দেশের মানুষ চাকার ব্যবহার জানতো। চাকা না থাকলে, বুঝতেই পারছো, সবই অচল। কিছুই চলে না। মানুষ যখন চাকার ব্যবহার জানতো না তখন ভারি জিনিস এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যেতে হলে সে কী ধাক্কাধাক্কি আর টানাটানি! সবাই ঘেমে নেয়ে অস্থির। এ কারণেই বলা হয়, মানুষের জীবনে দুটি জিনিসের ব্যবহার খুবই গুরুতর। এক—আগুন। দ্বিতীয় এই চাকা।

আগুন তো ছিলই। মহেঞ্জোদরোয় চাকাওয়ালা গরুর গাড়িও ছিল। তার মানে, আসল জিনিসটিই ছিল। বড়রা যখন এ-গাড়িতে মালপত্তর চাপিয়ে চলেছে, ছোটরাও তখন হেট্-হেট্ করে খেলনা গাড়ি চালাচ্ছে বাড়ির উঠোনে। হয়তো বা ঘরেই। তার অর্থ কিন্তু এই নয়, সারাদিন শুধু গাড়ি-গাড়ি খেলা, লেখাপড়ার কোনও বালাই নেই। তাও করতে হতো। কারণ, মহেঞ্জোদরোর লোকেরা সেই আদ্যিকালেও কিন্তু লেখাপড়া জানতো। তবে মজা এই, তাদের অ-আ-ক-খ এখনও কেউ পড়তে পারছে না। মাস্টার মশাইরাও না।

শ্রীপান্থ

কুঠির মাঠে

মহাশ্বেতা দেবী

সেই যে কথায় বলে, 'দুষ্টু গাইয়ের চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।' কথাটা বোধ-হয় সুদামদের মুংলীর মত কোন গাইকে দেখে লেখা। চৈত্রের বিকেল। সূর্য ডুবতে এখনো প্রহরখানেক বাকি। আকাশ কালো করে মেঘ ঘনাল। পশ্চিম দিক থেকে ঝোড়ো বাতাস বইতে শুরু করল। সুদাম কোম্পানীর বাগানে আম কুড়োচ্ছিল। ওদের রাখাল মদন এসে বলল, 'দাদা, চল্‌তো আমার সঙ্গে। মুংলীটাকে আনতে হবে।'

'তুই যা না। আমি আম কুড়োচ্ছি না?'

'বিলের দিকে গেল যে।'

বিল বলতে কাশিমবাজারের কোম্পানীর কুঠি ছাড়িয়ে অনেক উত্তরে কবেকার কোন মরা নদীর সোঁতায় বিল। বিলের পুব পাড়ে চোরাবালির দ'ক। ফি-সনে কয়েকটা পাল-ছুট গরু-মোষ-বাছুর ওখানে চোরাবালিতে তলিয়ে মরে। মুংলী সেই বিলের ধারে ঘাস খেতে গিয়ে সেদিনই বালিতে তলিয়ে যেত। সুদাম আর মদন টেনে তুলেছিল।

ঝড়ের ঝাপটা থেকে বাঁচতে নিচু হয়ে ওরা ছুটছিল। ছুটতে ছুটতে মদন বলল, 'কি পাজি ওই নন্দ ঘোষটা তাই বল! তোর হাড় জ্বালাচ্ছিল বলে বামুনকে গো-দান করতে মুংলীটাকে দিবি? এই ঝড়ে যত গাইবাছুর তরাসে গোয়ালে ফিরছে, সে দেখ নির্ঘাত বিলের দিকে গেছে।'

সুদাম বলল, 'বাবা মুংলীকে গো-দান করে দিতে পারে না কাউকে? তাহলে বেশ হয়।'

'গিন্নিমা দিলে তো। আবার সোহাগ করে বজ্জাত গরুর গলায় লাল-নীল ফটিকের মালা পরিয়েছে।'

'জল নামল মদনদা।'

'চল্‌ চল্‌, গাছের নিচে চল্‌।'

উঁচু পাড়ে বটগাছের নিচে দাঁড়িয়ে-ছিল বলে সুদাম গোরাটাকে দেখতে পেল। গোরাটা ঘোড়াটাকে বালি পেরোবার জন্যে সমানে চাবুক মারছে, ধমক দিচ্ছে, ঘোড়াটা শুধু নাক ফুলিয়ে আপত্তি জানাচ্ছে।

'দেখ কাণ্ড! বিলের ওপারে পলু কুঠিতে গিয়েছিল বুঝি, এখন ঝড়ের মুখে পড়ে কাশিমবাজারে তাড়াতাড়ি ফিরবে বলে বালির ওপর দিয়ে সিধে রাস্তা ধরেছে। ও দাদা, ডাক্‌ না তুই!'

'তুমি ডাক মদনদা।'

'না বাবা! আমি গোরাকে বড্ড ডরাই। গ্যাট-ম্যাট করে দেবে আমাকে।'

'মুংলী তো নেই?'

'নাঃ।'

সুদাম নিচু হয়ে ছুটল। কাছে গিয়ে বলল, 'ও সায়েব, যেও না, যেও না, ও চোরাবালি।'

আশ্চর্য! গোরাটা কেমন বাংলা বলল দেখ। বলল, 'কি বলছ? কি বললে?'

সুদাম একটা ঢেলা ছুঁড়ল বালির ওপর। ঢেলাটা ডুবে গেল। গোরাটা নেমে দাঁড়াল। ঘোড়াটাকে টেনে আনল পেছনদিকে। বৃষ্টির সঙ্গে বড়-বড় শিল পড়ছে। শিলগুলো বালিতে পড়ছে, ডুবছে। গোরাটা সুদামের সঙ্গে সঙ্গে এল। মদন বটগাছের নিচ থেকে নেমে এল।

গোরাটা বলল, 'এখানে দাঁড়াবে, না বাড়ি যাবে?'

'বাড়ি যাব। জল ধরতে অনেক দেরি।'

'চল, তোমার বাড়ি দেখে আসি।'

সুদাম কথা বলল না। আগেই কাশিমবাজারের কুঠিতে অনেক গোরা থাকত। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ফুরোতে আরো অনেক গোরা এসেছে। গোরাদের সঙ্গে সুদামরা কথা বলে না। ওরা ত বাংলা বলে না। কিন্তু এ গোরাটা কিরকম বাংলা বলছে দেখ।

ঘোড়া হাঁটছে। ঘোড়ার লাগাম ধরে গোরাটা। ওর পেছনে সুদাম, সব চেয়ে পেছনে মদন।

মদন বলল, 'এখন কত সামগ্রী লাগবে ঠিক কি?'

'কেন?'

'মুংলী নির্ঘাত চোরাবালির দ'কে পড়েছে। গরু মরলে প্রাশ্চিত্তির করতে হবে না? বাবা! বামুনের গরু! প্রাশ্চিত্তির না করলে ও গো-ভূত হয়ে থাকবে না?'

বাড়ি না পৌঁছতে বৃষ্টি ধরে এল।

'এইটে তোমার বাড়ি?

এটা তো বাণেশ্বর কাব্যতীর্থের বাড়ি।'

'আমাব বাবা।'

সুদামের বাবা বেরিয়ে এলেন। গোরাটা বাবাকে দেখে হাসল। বলল, 'পণ্ডিত, তোমার ছেলে আমার প্রাণ বাঁচাল।'

'আপনি এখানে?'

'এসেছিলাম।'

'আমরা তো শুনলাম...আপনি এখন...কলকাতায় গড়ের লাট?'

'ঠিকই শুনেছ।'

'আপনি...এমন একা...'

'আরে, কতকাল আসিনি এদিকে। ভেবেছিলাম জঙ্গলের পলুকুঠিটা দেখে যাব, ঝড়ে পড়লাম। বিলের চোরা-বালির কথা ত জানতাম না। তোমার ছেলে না দেখলে আজ আর বেঁচে ফিরতাম না।'

'এখন কোথায় যাবেন?'

'কাশিমবাজার ফিরব। সকলে হয়ত আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। তুমি এখন কি করছ?'

'যা করতাম।'

'আমার কথা তো শুনলে না, কলকাতা এলে না। সংস্কৃত ব্যাকরণ

লেখাচ্ছি. আরো আরো বই জোগাড় করছি, কত পণ্ডিত এল। তুমি এলে না।'

'অন্নদাতাকে ছাড়তে নেই যে?'

'ফোর্ট উইলিয়মের গভর্ণর কি নন্দকুমারের চেয়ে কম? তোমাকে অন্নের কথা ভাবতে হত?'

সুদামের বাবা হাত তুলে শুনো যোড় করে বললেন, 'ভয় করে সাহেব। তখন তুমি ছিলে কুঠির সাহেব, আমি টুলো পণ্ডিত। এখন কি আমি তোমার কাছে যেতে পারি?'

'তোমার পুঁথিগুলো কি করলে?'

'আছে।'

'নন্দকুমার কি চিরকাল থাকবে?'

'আমিই কি থাকব?'

গোরাটা ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল, চলে গেল। সুদামের বাবা ভুরু কুঁচকে কি ভাবতে ভাবতে দরজা বন্ধ করলেন। সুদামকে ডেকে বললেন, 'কাপড় ছেড়েছিস?'

সুদাম ঘাড় কাত করল। গোরাটাকে বাবা চেনেন? গোরাটা এমন বাংলা শিখল কি করে?

বাবা বললেন, 'আজ যে তুই ওকে বাঁচিয়েছিস, ও যে এসেছিল, কাউকে বলিস না। মদনও যেন না বলে।'

'আঁধারে যেতে পারবে, বাবা?'

সুদাম সবচেয়ে ছোট। ওর অন্য ভাইবোনরা বাবার সঙ্গে এত সহজভাবে কথা বলে না। সুদামের বাবা খুব কম কথা বলেন। সুদামের কথার উত্তরে বাবা বললেন,

'চোখ বেঁধে ছেড়ে দিলে কাশিম-বাজার-মুর্শিদাবাদ-কান্দী-ভগবানগোলা সব ঘুরে আসবে। তোর চেয়ে বেশি পথ চেনে।'

'বাংলা জানে কেমন করে, বাবা?'

'বাংলা জানে, ফারসী জানে, হিন্দী জানে। কুঠির খেতে যারা কাজ করত, তাদের সঙ্গে রাজমহলের মানুষের ভাষায় কথা কইত।'

'কে বাবা?'

'একটা সায়েব। আমার কাছে সংস্কৃত শিখত।'

সুদাম ভেতরে চলে গেল। মদন বলল, 'কাণ্ড দেখ্ দাদা! বামুন পণ্ডিতের গরু, তার বুদ্ধি কত! আমরা ওকে খুঁজে মরতেছি, মুংলী দেখ্‌গা গোয়ালে ঢুকে বসেছিল।'

মদনের কথা শুনে সুদাম বুঝল বাবা ওকে সব কথা বলেননি। মদন হাত-পা নেড়ে মাকে বলছিল, 'হ্যাঁ গো গিন্নিমা! তখন কুঠেল ছিল, এখন উনি কলকেতায় লাট হয়েছে। উনিই গো! তখন দেখে বুঝিনি। তখন কত্তার সঙ্গে ছাতা, পুঁথির বোঝা নিয়ে আমি যাইনি? পরে দেখেই বুঝেছি। আমাকে চেনেনি, বুঝলে? সেবার আমার কথায় ডাহাপাড়া যেয়ে বাঘ মেরেছিল না? বুঝলি দাদা, এই বড় বাঘ, হাঁড়ির মত মাথা হস্তেলের মত রং।'

'মদন, আর বকিস না বাবা। সন্ধ্যে কাজ বাকি।'

ওঃ, কত্তা একবার বললে উনি এখনো রান্না করে দেয়।'

'তোর কত্তা যদি রাজা হবে। তবে বনের মোষগুলো খেদাবে কে?'

সুদামের মা উঠোন ঝাঁট দিতে লাগলেন। ঝড়ে পাতা উড়ে উঠোন বোঝাই হয়েছে। ঝাঁট দিতে দিতে বললেন, 'সুদাম, তেল-সলতে আছে কি না দেখ্ গে।'

বাবার ছাত্র পড়াবার, পুঁথি লিখবার ঘরে তেল-সলতে দিয়ে পিদিম সাজিয়ে রাখা সুদামের কাজ। বাবার ঘরে কাঠের পাটা বাঁধা পুঁথি আছে কত। সব তালপাতার পুঁথি। তাল-

পাতার পুঁথি জীর্ণ হয় খসে পড়ে। এখন কোমপানীর কাজকর্ম সব তুলোট আর বেলে কাগজে হয়। মুর্শিদাবাদ থেকে বাবা কাগজ আনান, পুঁথিগুলো কাগজে নকল করেন। মা বলেন পুঁথিগুলো বাবার প্রাণ।

রাতে বিছানায় শুয়ে সুদাম বলল, 'মা, সাহেবটা 'নন্দকুমার' বলল কাকে? দাওয়ানজীকে?'

'আর কাকে?'

বাবাকে কলকাতা যেতে বলছিল।'

'তোর বাবা যাবে কলকাতা? ফরাসডাঙা গেলে জমিজিরেত-গাইগরু-পাকা কোঠাবাড়ি পেত, তা গেল? বড়-নগর গেলে নাটোরের রানী মাথায় করে রাখত, তা গেল? ওই এক কথা। অন্নদাতাকে ছেড়ে গেলে মহাপাপ।'

বাবার কাছে সুদাম সব কথা শুনেছে। ওদের বাড়ি ছিল জিরেট-কাসুন্দে গ্রামে। গ্রাম ভেঙে ভাগীরথীর তলে চলে যায়। তখন বাবা পুঁথিপাটা, ছেলেমেয়ে নিয়ে গাছের নিচে বসে-ছিলেন। অত বড় পণ্ডিত, অত নাম, কুঞ্জঘাটা থেকে স্বয়ং নন্দকুমার ছেলে গুরুদাসকে পাঠিয়েছিলেন। বলে-ছিলেন, 'বলবে উনি এলে আমি ধন্য হব। বলবে, 'শ' বিঘে ব্রহ্মত্র জমি দেব, ঘর তুলে দেব।'

সুদামের বাবা বলেছিলেন, 'একশো বিঘে কি বলছেন? আপনার বাবা কি আমায় চাষেবাসে জড়িয়ে রাখতে চান? দশ বিঘে জমি হলেই আমার চলে যাবে।'।

এ কথা শুনে নন্দকুমার নিজে এসেছিলেন। বলেছিলেন, 'এমন কথা ত কেউ বলে না। এমন কথা বলার মানুষ এখনো মুর্শিদাবাদে আছে? আপনি চলুন। দশ বিঘে জমিই নেবেন।'

সুদামের মা নাকি বলেছিলেন 'ছেলেদের কথাও ভাববে না? অত জমি ছেড়ে দিলে?'

সুদামের বাবা বলেছিলেন, 'বিষয় বড় বিষ বলাইয়ের মা। দেওয়ানজীকে দেখছ না? নাটোরের রানীকে স্বচক্ষে দেখেছ না? সম্পত্তির কথা ভাবতে ভাবতে অশান্তিতে জ্বলছে?'

সুদামের বাবার সম্মান খুব। কুঞ্জ-ঘাটা থেকে বছরভোর পালাপার্বণে সিধে আসে। বাবা ছাত্র পড়িয়ে কিছু নেন না। যে যেমন পারে, ঘরের জিনিস, খেতের ফসল দিয়ে যায়। আজকাল ছাত্র আসতে চায়না। কোম্পানীর আমলে ফারসী লিখলেই সুবিধে। সংস্কৃত লিখলে নাকি সুদামের বাবার মত হাল হয়। পেটে অগাধ বিদ্যেবুদ্ধি, নিজের মাথায় তালপাতার ছাতা, গিন্নির হাতে লাল শাঁখা।

কোমপানীর কাজে গেলেই কোঠা-দালান-গোলায় ধান-সিন্দুকে টাকা-জমিজিরেত হয়। সুদামের মামারাই ৩ ইট পুড়িয়ে দালান দিল। সুদামের বাবা বলেন, 'ওসব মিথ্যে জিনিস।'

সুদাম আর মদন মুংলীকে খুঁজতে বিলের ধারে গিয়েছিল, তার-পর দুবছরও কাটল না, সুদামের বাবা মারা গেলেন। মা বললেন, 'বলাই, তোরা কুঞ্জঘাটা যা। দাওয়ানজীকে বল।'

তখন ওরা দেওয়ানজীকে বলবে কি, কুঞ্জঘাটার প্রাসাদে তখন তোল-পাড় চলছে। কি যে হয়েছে তা সুদামের দাদারা বুঝল না। শুনল দেওয়ানজী মহা বিপদে পড়েছেন। কলকাতা নিয়ে গেছে ওঁকে।

সুদামের বড় মামা এলেন। বললেন, 'তোর বাবা কোনদিন ভাল কথা কানে নিলেন না, অন্নদাতাকে ছাড়ব না বলে কোট ধরে রইলেন, এখন অন্নদাতার প্রাণ বুঝি থাকে না।'

'কেন দাদা?—সুদামের মা কিছুই বুঝলেন না।

'হেস্টিংস এখন বড়লাট। চিরকাল দাওয়ানজীর সঙ্গে তার আড়াআড়ি। দাওয়ানজীকে জালিয়াত বলে ধরে নিয়ে গেছে শুনিসনি তোরা?'

'না দাদা।'

দাওয়ানজীর সম্পত্তিই থাকে না থাকে! দাওয়ানজী ত কম বুদ্ধি ধরেন না? নাটোরের রানীকে সব জানালেন। বললেন, এই যে ধরছে, আর জীয়ন্তে বেরোতে দেবে বলে মনে হয় না। যত বিষয় করছি, সব যাবে। ব্রহ্মত্র-দেবত্র কেউ নিতে পারে না। তাই দাওয়ান-জীকে বাঁচাতে নাটোরের রানী দলিল করে লিখে দিলেন, কিছু সম্পত্তি রাজার নিজের নয়, তিনি ব্রাহ্মণকে দান করেছেন। ওটুকু যদি বাঁচে।'

'দাওয়ানজী যে মস্ত বড় মানুষ গো।'

'কোম্পানীর বড়লাটের চেয়ে ত বড় নয়? যাক, যা হোক। তা হোক, তোদের এ দশ বিঘে যে ব্রহ্মত্র, তার দলিল আছে ত?'

'না দাদা। শালগ্রাম সামনে রেখে দাওয়ানজী বললেন, ব্রহ্মত্র জমি দিলাম। দলিল ত নেই।'

'দলিল নেই?'

সুদামের বড় মামা 'মাথা নাড়তে লাগলেন। বললেন, 'তবে বুঝি ব্রহ্মত্র রাখতে পারবি না বোন। দাওয়ানজীর ওপর বড়লাটের যে রাগ। যদি মন্দ কিছু হয়, কিছু কি রাখতে দেবে?'

সেই 'মন্দ কিছুই' হল। সেই যে ধরা পড়লেন নন্দকুমার, আর তিনি খালাস পেলেন না। ১১৮২ সনের শ্রাবণ তখনো শেষ হয়নি, ভাগীরথী দিয়ে সারে সারে নৌকা আসতে লাগল।

নন্দকুমারের ফাঁসি হয়েছে। ব্রহ্ম-হত্যা হয়েছে বলে বহু ব্রাহ্মণ কলকাতা ছেড়ে নৌকায় চলে আসছেন এখানে। কুঞ্জঘাটা থেকে কাশিমবাজার, কাশিম-বাজার থেকে মুর্শিদাবাদ, বহু ঘরে উনোন জ্বলল না, অরন্ধন পালন করল বহুজন। সুদামদের মত যারা নন্দ-কুমারের আশ্রিত, তারা বুঝল কপালে সর্বনাশ ঘনাল। হেস্টিংসের রাগ ভীষণ রাগ। হয়তো তাদের জমিজমা অন্যদের বন্দোবস্ত দিয়ে দেবেন।

সুদামের বড়মামা বললেন, 'আমার কাছে চল্?'

সুদামের মা বললেন, 'না দাদা। এই পুঁথির পাহাড় নিয়ে কোথায় যাব?'

'যদি বের করে দেয়।

'গাছতলায় থাকব।'

'তখন গাছতলায় ছিলি, আমার ঘরদোর ছিল না। ওদের বাবাও কথা শোনেনি। এখন ওর বাবাও নেই। আরেকটা দাওয়ানজী কি আছে যে তোদের ডেকে নিয়ে যাবে? কাকে দেখে ডাকবে বল? ছেলেরা কি বাপের মত হয়েছে?'

'তা হোক।'

পাড়াপ্রতিবেশী সবাই বলল সুদামের মা মিছে জেদ করছেন। নন্দ-কুমারের আশ্রিত পরিজন, কারো মাথার ওপর চাল থাকবে না।

মদন কান চুলকে বলল, 'সবাকে আমার গ্রামে নিয়ে যেয়ে বসিয়ে দেব গিন্নিমা। দাদাগুলো কত্তার মত নয় বটে, ভামপানা আছে। তা ঘণ্টা নাড়বে বাড়ি বাড়ি পুজো করবে এখন। চাষা গ্রাম, বামুন নিয়ে গেলে আমারও মান বাড়বে।'

সুদামের মা বললেন, 'নয় তাই গেলাম। এই পুঁথির পাহাড়?'

'কেন, চারটি ফেলবে, চারটি রাখবে? ওই পুঁথিপাটার জন্যেই ত কত্তার কোন উন্নতি হল না, শেষে ডাহা-পাড়ায় কার ঘরে পুঁথি দেখতে রোদে-তাতে জ্বর হয়ে সান্নিপাতি হয়ে কত্তা গেল।'

'পুঁথি আমি ফেলতে পারব না

মদন। কেউ আদর করে চেয়ে নিলে দিয়ে দেব।'

'তবে যা ভাল বোঝ কর গা। দাঁড় দাও এক তা'. বেড়াটা বেঁধে ফেলি। চল দাদা।'

সুদামকে ডেকে নিয়ে মদন চলে গেল।

নন্দকুমারের ছেলে গুরুদাসের হাত থেকে সাঁত্য সাঁত্য বহু সম্পত্তি চলে যেতে থাকল। নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার ছিলেন। পরে নদীয়া ও বর্ধমানে দেওয়ান হন। বিষয়সম্পত্তি তিনি অনেক করেছিলেন। এখন বহু ভূসম্পত্তি কোম্পানী নিয়ে নিল, বহু প্রজা নিরাশ্রয় হল। একদিন সুদামরা শুনল, স্বয়ং বড়লাট আসবেন। কাশিমবাজারে কুঠির মাঠে তাঁবু পড়বে। পুরনো প্রজা জমি রাখতে চাইলে খাজনা দিতে হবে নতুন হারে। ব্রহ্মত্রদেবত্র জমির দলিল না দেখাতে পারলে তা নতুন লোককে দেওয়া হবে।

বড়লাট এলেন। আশ্বিনের রোদে চারদিক ঝলমল করছে, তাঁবু পড়ল মাঠে। সুদামের বড়মামা বললেন, 'চল্ বলাই, কে'দে পড়ব পায়ে, তারপর দেখা যাবে।'

সুদাম বলল, 'আমিও যাব।'

'তুই গিয়ে কি করবি?'

'দেখব।'

'কি দেখবি?'

'লাট দেখব।'

কুঠির মাঠ লোকে লোকারণ্য। বিশাল তাঁবুর ভেতর লাল গদী আঁটা চেয়ারে ভারতের বড়লাট, কোম্পানীর বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস বসে আছেন। সুদামের বড়মামা বললেন, 'সব জানে, আইন জানে, এর থাবা পড়লে কি রক্ষে আছে? দেখ্, কে'দে কেটে কিছু করতে পারিস না কি।'

যখন ওদের সময় এল, পায়ে পায়ে মামা বলাইকে নিয়ে এগোচ্ছেন, সুদাম হঠাৎ মদনকে ঠেলে দিয়ে এগিয়ে গেল।

'হেই দাদা, ঠেলিস কেন?'—বলতে গিয়ে মদন বলল, 'আরে! সেই সুমুন্দি ত দাদা! কেমন বাবড়ি-ঝোলা পরচুলো পরেছে, তাই চিনতে পারিনি।'

সুদামের বড়মামা বলে যাচ্ছেন, 'এরা নন্দকুমারের আশ্রিত ছিল। এদের বাবাকে রাজা ব্রহ্মত্র দিয়েছিলেন, দলিল নেই'...

হেস্টিংস মাথা নাড়ছেন, না-না-না। এ-সব কথা তিনি শুনতে নারাজ। ভারতের লোকরা ত এ-সব কথাই বলে। গণ্ডগোল হতে নিয়ে কথা দেয়। শালগ্রাম শিলার সামনে মুখে মুখে জমি দান করে, সে-সব কথা শুনতে গেলে কোম্পানীর রাজত্ব চলে? দলিল-দস্তাবেজ ছাড়া তিনি কিছু মানবেন না, কোন কথা শুনবেন না।

সুদাম দাদাকে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল। সবাই বেজায় অবাক। নেড়া মাথা একটা দশ বছরের ছেলে বড়লাটের কাছে গিয়ে সরাসরি কি বলছে? ছেলেটা কি পাগল?

সুদাম বলল, 'এ আমার দাদা।'

'তুমি কে?'

'বাণেশ্বর কাব্যতীর্থের ছেলে।'

'তুমিই আমাকে চোরাবালির হাত থেকে বাঁচিয়েছিলে, তাই না?'

'হ্যাঁ সাহেব।'

'তোমার বাবা মারা গেছেন?'

'হ্যাঁ।'

সুদাম আসলে ভয় পেয়েছে। এখন তার চোখ জলে ভরে এল। বাবা! দাওয়ানজীকে যে ফাঁসি দিতে পারে, সে কি ওই লম্বা তরোয়ালটা দিয়ে ওর মুণ্ডু কেটে নিতে পারে না?

'তুমি বাণেশ্বর কাব্যতীর্থের ছেলে?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা।'

হেস্টিংস চোখ কুঁচকে ওকে দেখলেন। কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, 'বেশ। সব তোমাদের থাকবে। আমি মুনশিকে বলছি, লিখেপড়ে সব ঠিক করে দিতে হবে। কিন্তু একটা কথা আছে।

'কি?'

'বাবার পুঁথিগুলো আমাকে দিতে হবে। টোল কি দাদারা চালাচ্ছে?'

'না। দাদারা বলেছে পারবে না।'

'তবে ওই কথাই রইল।'

'মাকে বলব।'

'বলবে তোমার বাবা যত যত্নে রেখেছিলেন, তার চেয়ে অনেক যত্নে আমি বাবার পুঁথি রাখব। বলবে, আমি তোমার বাবার ছাত্র। এ পুঁথি আমি চেয়ে নিচ্ছি।'

'বলব।'

সুদাম ঘাড় কাত করল। মামা আর দাদা ওর হাত ধরে ওকে পিছিয়ে নিয়ে এল। সুদাম চট করে গিয়ে মদনের কাছে দাঁড়াল। মদন ওদের হাতে ছাতি দিল। রোদের তাত খুব। এখন দেড় ক্রোশ হেঁটে তবে বাড়ি পৌঁছতে হবে। ওরা মাঠ পেরিয়ে রাস্তায় নামল।

ছবি এঁকেছেন শঙ্কর বসু

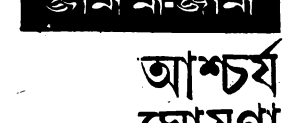

আশ্চর্য ঘোষণা

শুতে যাবার আগে ঘড়িটা মেলাবেন বলে বদ্যিনাথবাবু রেডিও খুললেন। তখন আবহাওয়ার খবর দেওয়া হচ্ছে, তার সঙ্গে এক ঝড়ের পূর্বাভাস। ঘোষক বলছেন...আলিপুর আবহাওয়া অফিসের সিসমোগ্রাফে ধরা গেছে এই ঝড়ের সংকেত। বঙ্গোপসাগরের উপকূল ঘেঁসে হু হু করে এই ঝড় এগিয়ে আসছে—অলটিমিটার বিকল হয়ে যাওয়ার ফলে এর সম্ভাব্য অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করা যায়নি। তবে সেস্মট্যান্টে এর যে গতি মাপা গেছে তাতে মনে হয় ঘন্টায় দেড়শো কিলোমিটার বেগে এই ঝড় আজ রাত এগারটা পঁয়তাল্লিশে কাকদ্বীপে আছড়ে পড়বে। সমস্ত জেলেদের সাবধান করা হচ্ছে...দয়া করে...

বদ্যিনাথবাবু শুনতে শুনতে গুম হয়ে গেলেন। প্রথমে বললেন, বটে? তারপর বললেন বল কিহে? তারপর বললেন আচ্ছা? তারপর বললেন থাক আর বেশি দয়া করে কাজ নেই। এই বলে ঘুমোতে যাবার বদলে কাগজ-কলম নিয়ে খবরের কাগজে একটা চিঠি দিতে বসলেন।

বদ্যিনাথবাবুর এই আশ্চর্য ব্যবহারের অর্থ কি?

উত্তর :—সিসমোগ্রাফে ভূমিকম্পের কম্পন ধরা পড়ে। অলটিমিটার উচ্চতামাপক যন্ত্র। সেস্মট্যান্ট দিয়ে কোণ মাপা হয়।

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

টারজান
এডগার রাইস বারোজ
হাতি! চতুর্দিকে হাতি! আশ্চর্য, একটা শব্দ পর্যন্ত শুনতে পাইনি!
যখন দরকার হয়, তখন হাতি বড় নিঃশব্দে চলাফেরা করে! কিন্তু ওগুলো হাতি নয়!
তুমি আমাকে যে ফোটো দেখিয়েছিলে তার থেকেই বুঝতে পেরেছিলুম যে, হাতির কঙ্কাল নয়, ওগুলো অন্যকিছু।
এ তাহলে কোন্ জন্তু কোরক?
প্রাগৈতিহাসিক যুগের ম্যামথ ... পিঠে যোদ্ধা এমন যোদ্ধা আর কখনও দেখিনি!
স্পা ফন! স্কোয়া ট্রন্ট!
কী বলছে কিছু বুঝতে পারছ কোরক?
না, তবে কী চায়, সেটা অনুমান করতে পারছি। ও চায় যে, আমরা ওইদিকে যাই!

এরপর পঞ্চাশের পাতায়

ফুটবলের যাদুকর

পেলে! একটি দু অক্ষরের শব্দ : পেলে! এই যাদু শব্দটি একটি বিস্ময়কর মানুষের নাম। 'পেলে' নামটি কানে গেলে, সারা বিশ্বের ফুটবল প্রেমিকরা সপ্রশংস মনে বিস্ময় মানে।

আমার মনে হয় মাঝে মাঝে এ মর দুনিয়ায় নেমে আসে কিছু সংখ্যক দেবদূত মানবরূপে। নইলে কোন একটি বিশেষ মানুষের পক্ষে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এমন নিদারুণ অলৌকিক গুণ বা ক্ষমতার অধিকারী হওয়া কিছুতেই বুঝি সম্ভব হত না।

ফুটবল খেলোয়াড় পেলে তেমনি এক অকল্পনীয় ক্ষমতার মানুষ। ফুটবল, যা কিনা চামড়ার একটা নির্জীব বল, ওর পায়ে পড়ে তা যেন কথা কয়ে ওঠে। ওর কাছে ফুটবল যেন ওর পায়ের, কাঁধের, মাথার, হাঁটুর, পেটের দাসানুদাস ক্রীতদাস।

বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে ওর খেলা দেখতে দেখতে মনে হয়, বল যেন মন্ত্রের দ্বারা সম্মোহিত হয়ে ওর সঙ্গে নাচত নাচতে লাফাতে লাফাতে বিপক্ষ দলের গোল-অভিমুখে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যায়। সামনেকার বাঘা বাঘা পাঁচছয়জন খেলোয়াড় মিলে চীনের প্রাচীরের মত বাধা দিতে এসেও পেলের বলকে রুখতে পারে না।

একটি কাহিনী প্রচলিত আছে ওর সম্বন্ধে।

একবার একজন বৃদ্ধ খেলোয়াড়দের ড্রেসিংরুমে ঢুকে প্রশ্ন করে, হ্যাঁ, বাবারা, পেলে কার নাম? প্রশংসা শুনে তো কান ঝালাপালা হয়ে গেল। তাই সামনাসামনি একটু দেখতে এলাম।

সামনে বসেছিল একজন কৃষ্ণকায় যুবক, জার্সি পরতে পরতে সে বলে উঠলো, বুঝলেন দাদু, মাঠে নেমে যে প্রথম গোল করবে সেই জানবেন পেলে।

—তাই নাকি, বলো কি বাবা।

—ঠিকই বলেছি।

খেলা শুরু হতেই এক মিনিটের মধ্যে গোল হল। সারা মাঠে আকাশফাটা চিৎকার উঠলো, সাবাস পেলে। হিপ হিপ হুররে।

বৃদ্ধ দেখেশুনে তাজ্জব হয়ে গেলেন। এরই নাম পেলে। ড্রেসিংরুমে এই নিগ্রো যুবকই তাহলে পেলে স্বয়ং।

এবার দেখা যাক, এই দেবাংশী ফুটবল খেলোয়াড়, যাকে বলা হয়ে থাকে সর্বকালের সর্বসেরা ফুটবল খেলোয়াড়, যার নানাবিধ কৃতিত্বের নজির বিশ্বক্রীড়া ইতিহাসে বিরল, তার আসল পরিচয়টা কি।

পেলে। 'পেলে' হল ডাকনাম। আসল নাম : এডসন অ্যারান্তেস দা নাসিমেন্তো। এই নিগ্রো মানুষটি হল দক্ষিণ আমেরিকার পর্তুগীজ ভাষাভাষী রাজ্য ব্রেজিল-এর অধিবাসী।

সেখানকার সান্তোজ নামক বন্দরের ছোট্ট এক খনি-শহরে ১৯৪০ খৃস্টাব্দের ২৩শে অকটোবর এক গরীবের ঘরে তাঁর জন্ম। বাবা ভোঁন্ডনহোরাও ছিলেন ফুটবল খেলোয়াড়। নিজের অপূর্ণ আশা তিনি ছেলের মধ্যে দেখতে চাইলেন। ছেলেকে ফুটবল খেলায় হাতেখড়ি, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি প্রথমে দিলেন নিজে। পরে তাঁরই এককালের বন্ধু বিশ্ববিখ্যাত ফুটবলার ওয়ালদেমার দা ব্রিতোর হাতে শিষ্য হিসেবে তুলে দিলেন বালক পুত্রকে।

ব্রেজিল দেশটাই বুঝি ফুটবল পাগলের দেশ। সেখানকার ছেলেদের শৈশব থেকেই ধ্যান জ্ঞান হল ফুটবল। চামড়ার বল জোটে না তো ক্যাম্বিস বল, তা-ও না জুটলে ন্যাকড়ার বল। পথে-ঘাটে মাঠে প্রান্তরে অলিতে গলিতে ফুটবল খেলা চলছে তো চলছেই।

পেলেও ব্যতিক্রম নয়। গরীবের ছেলে, পয়সা নেই। অতএব ন্যাকড়ার বল বানিয়ে নিয়ে নিজ মনে খেলে। শুরু থেকেই সে বলের ওপর কন্ট্রোল বা আধিপত্যের চেষ্টা প্রাণপণে আরম্ভ করে দেয়। আর কিভাবে গোল করা যায় তারই অক্লান্ত ধান্দা চালিয়ে যায়।

দরিদ্র বালক পেলে এরপর বুট, অ্যাংক্লেট, নী-ক্যাপ প্রভৃতি কেনবার জন্য এক অদ্ভুত পরিকল্পনা করল। বাড়ির পাশ দিয়ে গেছে রেলপথ। সেখান দিয়ে মাল বোঝাই মালগাড়ি চলে কিকিক করে। ওয়াগনের দোলানীতে লাইনের পাশে পড়ে কড়াইশুঁটি ও মটরশুঁটি-গুলো জমিয়ে জমিয়ে বিক্রী করে এবং সেই টাকায় কিনে ফেলে বুটপট্টি অ্যাংক্লেট, নী-ক্যাপ, বল প্রভৃতি। এতে ওর সময় লাগে প্রায় সোয়া বছর। তখন ওর বয়েস মাত্র দশ।

সঙ্গে সঙ্গে চলে বিরামহীন অনুশীলন। আর দেহকে জিমন্যাস্টিকের ভঙ্গিতে নানা অবিশ্বাস্য অ্যাংগলে হেলিয়ে দুলিয়ে উপুর হয়ে চিৎ হয়ে দেঁড়ে লাফিয়ে একেবারে মেশিনের মত করে তোলে। এই সব নিজের মাথা থেকে নিত্য নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে পরবর্তীকালে সে যাদুর খেলা দেখিয়েছে।

একদা এক বড়দের খেলায় অনুপস্থিত একজন খেলোয়াড়ের পরিবর্তে ১৩ বছরের বাচ্চা ছেলে এই পেলে প্রথম নেমেই যা করল তাতে চতুর্দিকে চরম হৈহৈ পড়ে গেল। ১১টি গোল-এর মধ্যে ঐ কিশোর বালক একাই ৯টি গোল করে বড়দের নাকে ঝামা ঘষে দিল। গুরু ব্রিতো বুঝলেন এ ছেলেকে রোখবার সাধ্য কারুর নেই। ক্রমেই দুর্ধর্ষ হয়ে উঠলো পেলে। কেউ রুখতে পারছে না এই তুফানী খেলোয়াড়ের অব্যর্থ গোল করবার ক্ষমতাকে।

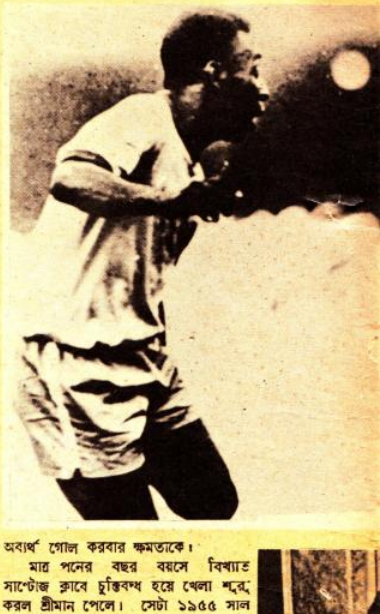

মাত্র পনের বছর বয়সে বিখ্যাত সান্টোজ ক্লাবে চুক্তিবদ্ধ হয়ে খেলা শুরু করল শ্রীমান পেলে। সেটা ১৯৫৫ সাল এবং প্রথম খেলায় নেমেই গোল। এই আরম্ভ। শুভারম্ভ।

তারপর যতদিন গেছে, গোল, গোল আর গোল। বছরে সে ক্লাবের হয়ে গড়-পড়তা ১০০টি গোল। সমস্ত খেলোয়াড় জীবনটাই বন্দুকের গুলির মত এক নিশানায় গাঁথা, গোল, গোল আর গোল। পেলের পায়ে বল, অতএব আর রক্ষা নেই। যতবড় টিমই হোক, যতজনই বাধা দিক না, গোল হবেই। ওর খেলার রীতি-পদ্ধতি কৌশলের হদিস আজ পর্যন্ত কেউ পায়নি। নিত্য নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবন, চমকের পর চমক দিয়ে খেলা হল ওর বিচিত্র বৈশিষ্ট্য।

ষোল বছর বয়সেই পেলের দারিদ্র্য ঘুচে গেল। ওর জন্মদিনে ক্লাব কর্তৃপক্ষ দু বছরের জন্য ওর সঙ্গে নতুন চুক্তি করল, প্রচুর অর্থ সম্মান দক্ষিণা। এই বয়সের কোন খেলোয়াড় এযাবৎ এত পরিমাণ অর্থ আর পায়নি তখনো।

অনুশীলন ও খেলা সমানে চলতে লাগলো। বল নিয়ে যেমন দুরন্ত গতি, তেমনি তুলনাবিহীন ড্রিবলিং, হেড করার

পেলে

বীরু চট্টোপাধ্যায়

কৌশলের কথা ভাবা যায় না। ডানপায়ে বল ধরে বাঁ হাঁটু। তারপর ডান হাঁটু দিয়ে মাথায়, সেখান থেকে আলতো হেড করে বল শূন্যে থাকতেই পা দিয়ে প্রচণ্ড ভলি সট, বিরোধী পক্ষের খেলোয়াড়দের ভ্যাবাচেকা খাইয়ে গোলকীপারকে যেন অন্ধ করে গোল দিয়ে দিত পেলে। কখনো বিপরীত পক্ষের ব্যাকের পায়ে বল মেরে রিবাউণ্ড করিয়ে গোল করত এই ফুটবল যাদুকর। দুরূহ অ্যাংগল থেকে কি সট করে কি হেড করে ওর গোল দেওয়ার কায়দা দেখে বিশ্বখ্যাত খেলোয়াড়েরাও বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যায়। সাধারণ খেলায় তো আছেই এ সব কীর্তি দেখিয়েছে স্বয়ং বিশ্বকাপের খেলায়, বিশ্বকাপের ফাইনালে। যে প্রতিযোগিতায় খেলে থাকে ইয়োরোপের নানা-দেশের বাঘা বাঘা দল।

এরপর আরম্ভ হল নোংরামি। সোজা পথে নাজেহাল হয়ে বিরোধীরা যখন সুবিধে করতে পারল না তখন শুরু হল খেলার মধ্যে মেরে আহত করবার শয়তানি, পেলেকে জখম করবার জঘন্য এক ষড়যন্ত্র। দুচারবার সে আহতও হল। শেষে ১৯৬৬তে বিশ্বকাপে ঐ ধরনের এক হীন ব্যাপারের পর সে স্থির করল আর খেলবে না সে। পরে অবশ্য বহু ধরাধরির পর ১৯৭০-এর বিশ্বকাপ খেলে নিজদেশ ব্রেজিলকে জয়ী করে ছাড়লো।

একটা মাত্র মানুষ যে খেলার মাঠে এতটা আলোড়ন আনতে পারে এ ব্যাপার পেলের আগে কেউ দেখেনি। পেলের এই যাদু-পা ইন্সিওর করা ছিল ২০,০০০ ডলারে। দরিদ্র ছেলে পেলের পরবর্তী জীবনে হুহু করে অর্থাগম হয়েছে। ফিল্মস্টারের চেয়েও বহুলাংশে বেশী জনপ্রিয়তা ছিল ওর। একটি ফিল্ম কোম্পানী ওর জীবনী নিয়ে একটি ছবি করবার জন্য ওকে ৫০,০০০ ডলার দিয়েছিল। জনপ্রিয়তা এতই ছিল যে সে যেখানে যেত ভীড়ের যন্ত্রণায় প্রাণান্তকর অবস্থা হত।

ইউরোপে খেলতে যেত ওদের ক্লাব। প্রতি খেলায় প্রচুর পয়সা দিত তারা। তবে একটি শর্তে সে খেলায় অবশ্যই পেলের থাকা চাই। মিশরের এক ক্লাব পেলেকে নিয়ে এক একটি খেলায় ৪০,০০০ ডলার পর্যন্ত দিয়েছিল একবার। কোন কারণে পেলে মাঠে না নামতে পারলে দর্শকরা মহা উচ্ছৃংখল হয়ে গিয়ে মাঠে নেমে যা তা কাণ্ড বাঁধাতো।

পেলে। মানুষটি কিন্তু বড়ই সাদা-সরল দয়ালু চরিত্রের। কোন রকম প্রলোভন ছিল না তাঁর। পুরোপুরি নির্লোভ মানুষ। কোন অহংকার নেই, নেই কোন বাজে দেমাক। অটোগ্রাফ বা ইন্টারভিউ চাইলে কাউকে সে বিমুখ করে না। পত্রপত্রিকায় বিনা পয়সায় লেখা দেয়। বড় বড় খেলায় কৃতিত্ব সহকারে জিতলে জয়ের আনন্দে হাউ হাউ করে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দেয় নরম অন্তরের এই মানুষটি।

শোনা যায় একবার নাকি এই অলৌকিক মানুষটার ব্রেন, হার্ট-এ বা দেহের মাংসপেশীতে কি যাদু আছে তা পরীক্ষা করবার জন্যে ব্রেজিল ইউনিভারসিটির জনৈক প্রফেসর ও একজন ডাকতার পেলেকে ধরে নিয়ে গিয়ে কয়েক সপ্তাহ আটকে রেখে পরীক্ষা করেন। অন্য মানুষ হলে রেগেমেগে এক কেলেঙ্কারী করে মানহানির মামলাটামলা ঠুকে দিত। কিন্তু অতীব শান্ত ও কোমল চরিত্রের এই অসাধারণ ক্রীড়াবিদ কিছুই করেনি বা কিছু মনেও করেনি।

শুধু ফরোয়ার্ড পজিসনে নয়, পেলে যে কোন পজিসনেই একই দক্ষতায় খেলতে পারে। কতবার গোলকীপার অভাবে নিজেই গোলে খেলে অব্যর্থ সব গোল বাঁচিয়ে দিয়েছে পেলে।

একবার এক মজার ব্যাপার হল। একজন ভক্ত একদা চাওয়াতে পেলে তার নিজ জার্সিটা তাকে দিয়ে দেয়। ব্যস তারপরই শুরু হল গণ্ডগোল। দেখা গেল বেশ কিছুদিন এরপর পেলের খেলা পড়ে গেল। কিছুতেই আর মনোমত গোল দিতে পারছে না। ভয়ে ভয়ে পেলে তার এক বন্ধুকে বললে, নিয়ে এস ভাই আমার ঐ পয়া জার্সিটা ঐ ভক্ত লোকটার কাছ থেকে।

বন্ধু চলে গিয়ে জার্সিটা নিয়ে এল। সেটা পরে পুনরায় শুরু হয়ে গেল বাঘের খেলা। গোল, গোল আর গোল। অবশেষে শোনা গেল বন্ধু একটু তঞ্চকতা করেছে। ওটা নাকি ওর সেই পুরনো পয়া জার্সি মোটেই নয়। কেননা সেই ভক্ত লোকটাকে খুঁজে না পেয়ে বন্ধুটি ক্লাবের বাক্স থেকে যে কোন একটি জার্সি এনেই ওকে দিয়ে দিল। পেলে সে খবর জানতো না। একেই বলে কুসংস্কার। এই প্রতিভাধর মানুষটিও এর ব্যতিক্রম ছিল না।

নিজ দেশের প্রতি ছিল তার অসীম ভালবাসা। নিজ ক্লাবের প্রতিও তাই। সান্তোজ ক্লাবেই শুরু, সেই ক্লাবেই শেষ। রিয়েল মাদ্রিদ নামে বাইরের একটি টীম ওকে বহু অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে ভাঙিয়ে নিতে চায়, পেলে কিন্তু যায়নি। নিজ ক্লাবেই ওকে সপ্তাহে ৫০০ ডলার করে সম্মান দক্ষিণা বাড়িয়ে দিল। বহু লোকের কাছ থেকে প্রচুর সব উপহার পেয়েছে পেলে। গাড়ি বাড়ি শীততাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, বিচিত্র সব আসবাবপত্র। কাপ মেডেল শীল্ডের আর কে হিসেব রাখে!

ব্রেজিল সরকার ওকে জাতীয় সম্পদ-রূপে অভিহিত করে দেশের সর্বোচ্চ সম্মান 'রিও ব্রাঙ্কো অর্ডার'-এ ভূষিত করেছে। এসময় ওকে এক বিদেশী ক্লাব ৪½ লক্ষ পাউণ্ডের প্রলোভন দেখিয়েছিল। কিন্তু পেলে তা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে। এমনই নির্লোভ ও সৎ মানুষ সে।

১৯৬৯-এর ১৯শে নভেম্বর পেলের জীবনে এক মহা উল্লেখযোগ্য দিন। সেদিন সে তার জীবনের ১০০০তম গোল দিল। সেদিন স্টেডিয়ামে দর্শকদের কী উল্লাস আর কী আনন্দ। স্বপক্ষ ও বিপক্ষের প্লেয়াররা ওকে কাঁধে তুলে নিয়ে নাচতে লাগলো। সমস্ত ব্রেজিলেই যেন পড়ে গেল উৎসব আনন্দের সাড়া। সবাই হাসছে আর পেলে তখন কাঁদছে আনন্দের আতিশয্যে। আনন্দাশ্রু তার তামাটে রঙের দুগাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অনবরত। সেই স্টেডিয়ামের এক অনুষ্ঠানে ওকে চার পাউণ্ড ওজনের একটি সোনার তৈরী ফুটবল উপহার দেওয়া হয়। ব্রেজিল সরকার পরে ওর ছবি দিয়ে ডাক টিকিটও বের করে। সেই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে উঠে পেলে বলেছিল, তার নাকি এখন মনে পড়ে যাচ্ছে দুনিয়ার যাবতীয় সর্বহারা, দরিদ্র, অন্ধ ও বধির সব ছেলে মেয়েদের কথা। আগামী বড়দিনে সে সাধ্যমত সেই সব ছেলে মেয়েদের সাহায্য পাঠিয়ে মনে শান্তি লাভ করতে চায়।

এর দ্বারাই বিশ্ববিখ্যাত এই মানুষটির অন্তর গরীব দুঃখীদের জন্য কত সহানুভূতিশীল তা বোঝা যায়।

দাঁড়াও কোরক ! বোধ হয় আর পালাবার দরকার নেই ! হেলমেট-পরা মেয়ে-যোদ্ধারা হেরে যাচ্ছে !
চতুর্দিকে হাড়ের ছড়াছড়ি ... তার মধ্যে যুদ্ধ চলছে ... কুঁচি-দেওয়া-কাপড়-পরা মেয়ে-যোদ্ধারা জিতছে ...
হেলমেট-পরা মেয়েরা পালাচ্ছে !
এখন দেখা যাক, আমাদের সঙ্গে বিজয়িনীদের ব্যবহারটা কেমন হয় !
স্টার্ড নট ! ট্রনট !
বড়ো খটোমটো কথা !
সুতরাং যেখানে যেতে বলছে, যাওয়াই ভাল !
গিরিপথ দিয়ে বার্নি আর কোরক চলেছে ... পিছনে মেয়ে-যোদ্ধার দল
ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, তবু জনবসতির চিহ্ন নেই, শুধু পাহাড়গুলোর চেহারা ক্রমে পালটাচ্ছে ...
হঠাৎ সামনে জেগে উঠল এক অপরূপ হর্ম্য। তার চতুর্দিকে মেঘমালা। কোরক আর বার্নি বিস্ময়ে হতবাক্ !
RUSS MANNING

এরপর আগামী সংখ্যায়

আজব চিড়িয়াখানা

কারও দুটো পা। কারও চারটে। কারও পাখা আছে, কারও নেই। কারও শিং আছে, কারও নেই। কিন্তু সকলের গায়েই মাছের মতো আঁশ। সকলের পায়েই ছুরির মতো ধারালো নখ। সকলেরই রয়েছে সাপের মতো লম্বা লেজ। তাছাড়া চিনবার আর এক উপায় প্রত্যেকের মুখে রয়েছে লকলকে জিভ। নিঃশ্বাসে কখনও ধোঁয়া, কখনও আগুন। ড্রাগনের কথা কে না শুনেছে? অনেকে দেখেছেও নিশ্চয়। গল্পের বইয়ে অনেক ড্রাগন। গল্পের অনেক বীর ড্রাগন মেরেই নাম করা বীর। বিশেষ করে পশ্চিমে। ইউরোপে। ড্রাগন সেখানে এক ভয়াবহ জন্তু। তার মতো হিংস্র বুঝি আর কেউ নয়। ইচ্ছে করলে সে জলে ডুবে থাকতে পারে। ইচ্ছে করলে আকাশে মেঘের আড়ালে পালিয়ে যেতে পারে। তার সামনে পড়লে সব লণ্ড ভণ্ড। গরমের সময় ড্রাগন হাতি মেরে রক্ত শুষে খায়। কারণ হাতির রক্ত নাকি খুবই ঠাণ্ডা! সুতরাং, রক্ত হলেও ড্রাগনের কাছে আইসক্রীম সোড়া!

এদিকে চীনের মানুষের চোখে কিন্তু ড্রাগন সম্পূর্ণ অন্য ধরনের প্রাণী। চেহারা তার যেমনই হোক, স্বভাব চরিত্রে যাকে বলে রীতিমত ভালো মানুষ। সব দেশের সব ড্রাগনের মধ্যে সবচেয়ে নামী দামী চীনের ড্রাগন। কিন্তু গায়ে বিস্তর বল থাকা সত্ত্বেও সে কখনও খুনখারাপিতে মাতে না। সে সাহসী কিন্তু উদার। শক্তিমান, কিন্তু সাধারণত খুবই শান্ত শিষ্ট। মাটিতে সে-ধন দৌলত, বিদ্যাবুদ্ধিকে পাহারা দেয়। আকাশ বাতাস সব তার বশ। আকাশে তার পিঠেই দেবতাদের যত ঘর বাড়ি। সে মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরায়। তার এমনি আরও নানা ভালো ভালো কাজ। সেকালে চীনাদের সম্রাট যখন মারা যেতেন তখন ড্রাগনের পিঠে চড়েই স্বর্গে যেতেন তাঁরা।

কিন্তু আজব ব্যাপার, ইউরোপে তা নয়ই, ড্রাগনের দেশ চীনেও কিন্তু আজ ড্রাগন নেই। আমাদের দেশে তবু ময়াল সাপের পিঠে পাখা, আর পেটের নিচে পা ঝাটিয়ে মনে মনে ড্রাগন জাতীয় কোনও একটা প্রাণী তৈরী করা যায়। গোসাপ, গিরগিটি কিংবা বহুরূপীকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রঙ চড়িয়েও হয়তো বানানো যায় এক ধরনের ড্রাগন। কিন্তু চীনারা কথায় কথায় এতো ড্রাগন পেল কোথায়? অনেকে বলেন—একদিন এই ড্রাগন খুঁজে পেয়েছিল ওরা আকাশের দিকে তাকিয়ে। মেঘের মধ্যে। বর্ষার আকাশ। ক্ষণে ক্ষণে পালটে যাচ্ছে মেঘের চেহারা আর রঙ। তর্জন গর্জন। বিদ্যুৎ চমক। হঠাৎ ঝড়ো হাওয়া। বৃষ্টি। ঝড়।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে কোনও এক দুপুরে কি সন্ধ্যায় তাকিয়ে দেখো। মনে হয়, চেষ্টা করলে ড্রাগন দেখতে পারবে তোমরাও।

বহুরূপী

ছবি / আশিস মল্লিক

ছোটদের পাতা

নকশা / সুনীল শীল

ভ'ক ভ'ক হর্ন বাজে
শুনতে কি পাওনা?
আসছে মোটর গাড়ী
পাশে সরে যাওনা।
থামতো না গাড়ী যদি
চাপা খেতে এখনি।
পেছনে আসছে গাড়ী
চোখে কিহে দেখনি?
গাড়ীর ধাক্কা খেয়ে
ঠুকে ল্যাম্পপোস্টে
মাথায় গজাত আলু,
নাক যেত ঘষ্‌টে।
চিৎপাত হয়ে গিয়ে
মাঝখানে রাস্তার,
কোথায় ওষুধ পেতে?
কোথায় বা ডাক্তার?
পটল তুলতে যদি
ঠেলা সেকি সস্তা?
তাই তো এখনো বলি
দেখে চলো রাস্তা॥

শর্মিলা ঘোষাল

ইয়া মোটা পেল্লায়
পালোয়ান বক্‌শী,
মাথায় পাগড়ী বাঁধা
হাতে ধরা বড়শী।
তিনকোনা গোঁফ তার
উঁচুদিকে পাকানো,
ইয়া মোটা ভুঁড়ি তার
কিছু নীচে নামানো।
হাত-পা যেন থাম
দৈত্যের চেহারা,
চোখদুটো যেন তার
গোলগোল পেয়ারা।
মাথা উঁচু ক'রে চলে
নেই কোন খেয়াল'ই,
কাউকে সে কোনদিন
করেনাক' কেয়ার'ই।
ইয়া মোটা পেল্লায়
তার মত এক মোষ,
দাঁড়িয়ে রাগের চোটে
করছিল ভোঁস ভোঁস।
আনমনে পথ চলে
পালোয়ান বক্‌শী,
আকাশের দিকে চেয়ে
নাকে টেপে নস্যি।
আচমকা মোষটার
গায়ে লাগে ধাক্কা,
শিং-এর গুঁতো খেয়ে
পালোয়ান অক্কা।

সুমিতা দাস

কল্লোল মজুমদার

শূন্য কবে এলো

মাত্র দেড়শো দুশো বছর আগেও ইউরোপের পণ্ডিতেরা বলতো আরব দেশের লোকেরাই প্রথম দশমিক ধরে অঙ্ক কষার নিয়ম আবিষ্কার করেছে। কথাটা ঠিক হলে শূন্য (০) আবিষ্কারের গৌরবটাও আরবদের দিকেই যেত। কিন্তু আসল সত্যিটা ইউরোপের পণ্ডিতরা এখন স্বীকার করছেন।

এক থেকে পর পর দশটি সংখ্যা ধরে গননার নিয়ম কিন্তু খুব প্রাচীন-কালেই আবিষ্কার করা হয়েছিল। কে প্রথম করেছিল তার কোন স্পষ্ট প্রমাণ নেই। তবে প্রায় একই সময়ে ভারতবর্ষ, মিশর, ব্যাবিলন এবং চীনদেশে এর ব্যবহার দেখা যায়। পণ্ডিতেরা মনে করেন হাতের অথবা পায়ের দশটি আঙুলের জ্ঞান থেকেই পুরোনো দিনের বিজ্ঞানীরা এইভাবে চিন্তা করেছিলেন। যাই হোক তখনকার দিনের ভাষা তো আর আজকের মত ছিল না। মানুষের চেহারা যেমন হাজার হাজার বছর ধরে আস্তে আস্তে পালটে গেছে, ভাষা এবং অক্ষরও তাই। প্রাচীন ভারতবর্ষে লেখা হত খরোষ্ঠী এবং ব্রাহ্মী লিপিতে। আর আরবদেশে ছিল কিউনিফর্ম ও হায়রোগ্লিফিক লিপি। এই সব লিপিতেই সেই সময়কার সংখ্যা লেখা হত। তোমরা জান, সংখ্যা বোঝাতে গিয়ে মানুষ চিহ্ন তৈরী করেছে। এক থেকে নয় এবং শূন্য (০) এই দশটি চিহ্ন দিয়ে সবরকমের সংখ্যা লেখা হয়। কিন্তু শূন্য (০) আবিষ্কারের আগে বড় সংখ্যা লিখতে গেলেই হত মহা মুশকিল। ধর লিখতে হবে পাঁচ হাজার সাতাশ। তখন পাঁচ হাজারের জন্য একটি চিহ্ন (এটা কিন্তু পাঁচ ও হাজারের চিহ্ন মিশিয়ে তৈরী হত), কুড়ির জন্য একটি চিহ্ন এবং সাতের জন্য আর একটি চিহ্ন

কারজন পার্কে চারজন

কারজন পার্কে চারজন
গান গায় মিলিটারি সার্জন
তাল ঠোকে কিংকং টারজন
ম্যান্ড্রেক একজন
আর কে?

ছবি এঁকেছেন **সুনীল শীল**

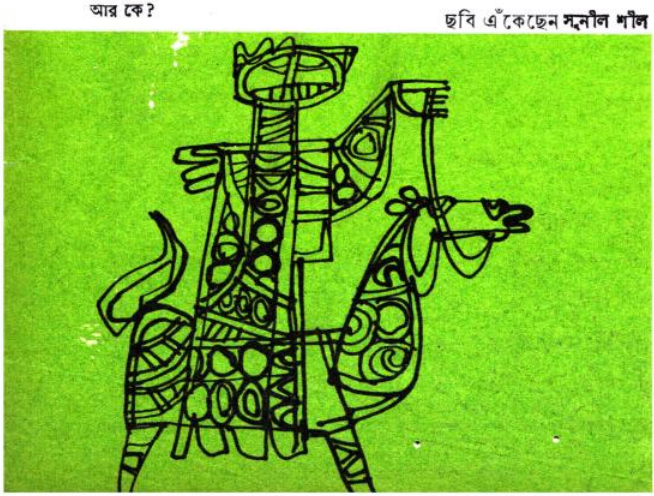

পাগলা-পাগলা লোকটা

পাগ্‌লা-পাগ্‌লা লোকটা
ছাগল চরায় মাঠে
আধ্‌লা ইঁটের বাড়ি বানায়
চোদ্দ মাইল হাঁটে
রোদের তাপে হয় না কাহিল
জোছ্‌না হলে হাসে
পাত্‌-কুড়োনো পান্তা পেলে
খাবেই গো-গ্রাসে
পাগলা-পাগলা লোকটা
বাদ্‌লা রাতে বসে
হেউ হেউ ঢেঁকুর তোলে
শব্দে পালায় মোষে,
পাগলা-পাগলা লোকটা
বেজায় রাশ্‌ভারী
মাথায় লম্বা গড়েরমাঠ
চোয়াল-ভর্তি দাড়ি!

তালীয় রঞ্জন ভাদুড়ী

তালের ওপর কাক বসলে
হয় যদি কাকতালীয়,
সে-তাল যদি নাকে পড়ে
হবে কি নাকতালীয়?
এবং সেটা পড়লে টাকে
অর্থটা তো একই থাকে—
যতই মাথায় গজাক-না চুল
ব্যাপারটা টাকতালীয়!

এইভাবে পর পর লিখে দেওয়া হত। তাই ভারতবর্ষে যখন শূন্যের (০) আবিষ্কার এবং দশমিক পদ্ধতির ব্যবহার শুরু হল তখন পণ্ডিতমহলে হৈ হৈ পড়ে গেল। কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে, আজকের মত নানাদিকে এত সুযোগ সুবিধে তখন ছিল না। তাই নতুন কিছু জানতে জানতেই দু পাঁচশো বছর কেটে যেত। যেমন ধরো গ্রীকরা বর্ণমালা দিয়ে সংখ্যা লেখার নিয়ম বের করে ৭০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে। কিন্তু এটা ছড়াতে সময় লাগে প্রায় আটশো বছর। ভারতের ক্ষেত্রেও তাই। আমাদের অগ্নিপুরানে কিংবা বাখ্‌শালী লিপিতে দশমিক ধরে সংখ্যা লেখার প্রমাণ আছে। ৬০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১০০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অন্তত ৩৩টি শিলালিপি ও তামার পাতে এই নিয়ম দেখা গেছে। আর্যভট্ট-ব্রহ্মগুপ্ত-ভাস্করাচার্য এইসব মহাজ্ঞানী লোকদের বইতেও দশমিক নিয়মে শূন্যের (০) ব্যবহার পাওয়া যায়। বেশীর ভাগ পণ্ডিত মনে করেন, যীশুখৃষ্টের জন্মের অন্তত দুশো বছর আগে হিন্দুরা শূন্য (০) নামে একটি সংখ্যা আবিষ্কার করেছিলেন যার মান সব সময়ে একের দশগুণ। আর্যভট্ট বর্গমূলের নিয়ম লিখতে গিয়ে খুব স্পষ্টভাবে শূন্যস্থানের জায়গায় শূন্যবিন্দু (·) ব্যবহার করেছিলেন। এই কারণে অনেকে মনে করেন তিনিই শূন্যের (০) আবিষ্কর্তা। আসলে কিন্তু তা নয়। খৃষ্টপূর্ব ২০০ অব্দে অর্থাৎ যীশুর জন্মের দুশো বছর আগে পিঙ্গল নামে এক বিজ্ঞানীর খোঁজ পাওয়া যায়। তাঁর লেখা ছন্দসূত্র নামে বইতে শূন্যের (০) ব্যবহার দেখা গেছে। তার মানে আর্যভট্টের জন্মের প্রায় ৭০০ বছর আগেই হিন্দু বিজ্ঞানীরা শূন্য বিন্দুর (·) আবিষ্কার করেছিলেন। ৬৪৭ খৃষ্টাব্দ নাগাদ আরব দেশের সিরিয়ায় এক পণ্ডিত ছিলেন সেভেরায় সেবক্‌ত। তিনি কি বলেছিলেন জান? বলেছিলেন—'যে সব গ্রীক পণ্ডিত নিজেদের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানী মনে করেন, তাঁরা হিন্দুদের সংখ্যাতত্ত্ব (অর্থাৎ শূন্যের ব্যবহার ও দশমিক নিয়ম) পড়ুন। তাহলে বুঝতে পারবেন জ্ঞানবিজ্ঞানে দখল রাখে, এরকম অনেক জাতি পৃথিবীতে আছে।' পরে আরবদেশের আরো দুজন মনীষী আল্‌-খোয়ারিজমি ও আল্‌-বেরুনী ভারতের সংখ্যা সম্বন্ধে খুব সুন্দর সুন্দর লেখা লিখেছিলেন। আসলে ১২০০ থেকে ১৩০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইউরোপ আরবদের কাছ থেকে শূন্য (০) এবং দশমিক নিয়মের কথা জানতে পারে। তাই এটা আরবদের আবিষ্কার বলেই ইউরোপের পণ্ডিতেরা চালিয়ে দেন। কিন্তু পৃথিবীর ম্যাপ একবার খুলে দেখ। আরবদেশের একদিকে ইউরোপ অন্যদিকে ভারতবর্ষ। সুতরাং বুঝতেই পারছ, জ্ঞানবিজ্ঞানের সব খবরাখবর আরবদেশের মধ্য দিয়েই বিনিময় হত তখনকার দিনে। এখন কিন্তু নানা পণ্ডিতের গবেষণায় প্রমাণ হয়ে গেছে যে, আরবদের অনেক আগেই হিন্দু সংখ্যা এবং শূন্য (০) ব্যবহারের কথা ইউরোপ জানতে পেরেছিল। শূন্য (০) ধরে এই যে দশমিক নিয়মের ব্যবহার, সেকালের হিন্দু পণ্ডিতেরা এর নাম দিয়েছিলেন 'দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন পদ্ধতি।'

ঃ এবার পূজোয় প্রকাশিত হচ্ছে ঃ

শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস সম্পাদিত

উৎসব ৭৲

সেপ্টেম্বর মাসে বৃহৎ আকারে প্রকাশিত হচ্ছে। ছোট ভাই-বোনেরা এখনি ১৲ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হও। গ্রাহক হলে ৬৲ টাকায় পাওয়া যাবে। সমস্ত নামী লেখকের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে প্রচুর ছবিসহ এবং মনোরম রঙিন প্রচ্ছদে শোভিত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে।

উৎসবে যাহা থাকবে : অ্যাডভেঞ্চার গল্প/হাসির গল্প/মজার গল্প/পুরাণের গল্প/ভূতের গল্প/রহস্য গল্প/সায়েন্স ফিক্‌শান/অনুবাদ/খেলাধূলা/ম্যাজিক/ছড়া/কবিতা প্রভৃতি।

ঃ প্রকাশিত হয়েই আলোড়ন তুলেছে ঃ

শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস সম্পাদিত

জলছবি ১২৲

আংশিক লেখক-সূচী :

সত্যজিৎ রায় ॥ জরাসন্ধ ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ আশা দেবী ॥ শক্তিপদ রাজগুরু ॥ শিবরাম চক্রবর্তী ॥ চিরঞ্জীব ॥ বীরু চট্টোপাধ্যায় ॥ আব্দুল জব্বার ॥ চিরঞ্জীব সেন ॥ সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ॥ শচীন বিশ্বাস ॥ হরপ্রসাদ মিত্র প্রভৃতি। ছোটদের উপহার-উপযোগী মনের মতন বই। সুন্দর রঙিন প্রচ্ছদে মোড়ানো এবং ভিতরে ছবিসহ প্রকাশিত হয়েছে।

এবার পূজোয় প্রকাশিত হচ্ছে ॥ যে বই আলোড়ন তুলবে ॥ আগেই গ্রাহক হয়ে রাখুন

দেশ বিদেশের ভৌতিক গল্প

২ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১৫৲ টাকা, ৫৲ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হলে ১৫৲ টাকায় পাবেন। অপূর্ব প্রচ্ছদে মোড়ানো হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে

শেক্‌স্‌পীয়র রচনাবলী ● টলস্টয় রচনাবলী ● মোপাসাঁ রচনাবলী ● গোর্কি রচনাবলী

৪ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১৫৲ টাকা ॥ ৫ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১৩৲ টাকা ॥ ৩ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১২৲ টাকা ॥ ৪ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১৪৲ টাকা

আলেকজাণ্ডার ডুমা ● এমিল জোলা রচনাবলী ● চার্লস ডিকেন্স ● স্কটের রচনাবলী

৪ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১৪৲ টাকা ॥ ৩ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১৪৲ টাকা ॥ ৪ খণ্ডে প্রতি খণ্ড ১৪৲ টাকা ॥ ৩ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১৪৲ টাকা

চেকভ রচনাবলী ● দস্তয়েভস্কি রচনা বলী ● গিরিশ রচনাবলী ● বঙ্গদর্শন ● ভূদেব রচনাবলী

৪ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১৪৲ টাকা ॥ ৫ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১৩৲ টাকা ॥ ৫ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১৫৲ টাকা ॥ ৮ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১৩৲ টাকা

প্রতিটি রচনাবলীর গ্রাহকমূল্য ৫৲ টাকা। গ্রাহক হবার ও মনিঅর্ডার পাঠানোর মূল কেন্দ্র ঃ জ্যোতি প্রকাশন ॥ ২এ, নবীন কুণ্ডু লেন, কলিঃ-৯।

(সি ৭৬১৮)

ANANDAMELA

দেড় টাকা

আনন্দমেলা